সাহিত্য-সাধক চিত্তরঞ্জন

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৬।

—প্রকাশক—

শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস, সি

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬।

দাম—দুই টাকা মাত্র

মুদ্রাকর

শ্রীবলদেব রায়

দি নিউ কমলা প্রেস

৫৭।২ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্তা মাতা বাসন্তী দেবীর করকমলে—

অহিংস সংগ্রামে যে মহিয়সী মহিলার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
অবদান, যিনি সেই অভূতপূর্ব্ব সংগ্রামে সর্ব্বাগ্রে
কারাবরণ করিয়া দেশবাসীর সমক্ষে অত্যুজ্জ্বল আদর্শ
স্থাপন করিয়াছিলেন, দেশবন্ধুর সর্ব্বকার্য্যে যিনি
তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতেন, যিনি
দেশবন্ধুর কারাবরণের পরে "বাঙ্গলার কথা"
সম্পাদনা করেন, সেই দেশবন্ধু-সহধর্ম্মিণী,
স্বরাজ-নেত্রী মাতা বাসন্তী দেবীর
করকমলে "সাহিত্য-সাধক চিত্তরঞ্জন"
পুস্তকখানি শ্রদ্ধাঞ্জলি
প্রদানে উৎসর্গ
করিলাম।

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত জীবনী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর ১২৭৭ বঙ্গাব্দে ২২শে কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে কলিকাতা পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে জন্মগ্রহণ করেন। দেশবন্ধুর জন্মভূমি বিক্রমপুর তেলিরবাগ গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম ছিল ৺ভুবনমোহন দাশ, মায়ের নাম নিস্তারিণী দেবী। তেলিরবাগের দাশ পরিবার দানশীলতা ও পরোপকার বৃত্তিতে বরাবরই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

দেশবন্ধু ষোল বৎসর বয়সে ১৮৮৬ সালে লণ্ডন মিসনারী স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। এই সময় তাহার পিতা ভবানীপুরে বাস করিতেছিলেন। ১৮৮৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ এ পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯০ সালে বি, এ পাশ করেন।

অতঃপরে সিভিল সার্ভিস পাশ করিবার জন্য পিতামাতা বিলাত পাঠান। ১৮৯২ সালে কিছুদিন পরীক্ষা দিয়া আর পরীক্ষা মন্দিরে উপস্থিত হন না। ১৮৯৩ আবার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যতম নেতা দাদাভাই নৌরজী পার্লেমেন্টে সভ্য হইবার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু রক্ষণশীল দলের নেতা লর্ড সেলিসব্যারী তাহাকে 'কালা আদমী' (Black man of India) বলিয়া গালি দেয়, যদিও দাদাভাই নৌরজীর অপেক্ষা ইহুদী জাতীয় উক্ত লর্ডের গায়ের রং একটু ময়লাই ছিল। আর ম্যাকলিন নামে আরেকটা লোক ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানদিগকে ক্রীতদাসের জাতি বলিয়া আখ্যা দেয়। চিত্তরঞ্জনের জাতিগত

সম্মানে বড় আঘাত লাগে, তিনি ছাত্রাবস্থায়ই নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া ম্যাক্লিনকে পঙ্গু করিয়া ফেলেন। সেবারে দাদাভাইও জয়ী হন, এদিকে ম্যাক্লিন হারিয়া যায়। ফলে ১৮৯৩ সালে চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও চাকুরী পাইলেন না। ৪২ জন চাকুরীতে লওয়া হইল। ইনি হইলেন ৪৩ স্থানে। ইহার পরে দুইজন আবার ছাড়িয়াও দিয়াছেন, তথাপি তাহাদের স্থানেও তাহাকে লওয়া হইল না। ইতিপূর্ব্বে লওয়া হইত, কিন্তু এবার চিত্তরঞ্জনকে না দেওয়ার জন্যই সেই নিয়মের ব্যবস্থা হইল। সুসভ্য ইংরাজের কারসাজি প্রথম হইতেই তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

প্রথমে খুব কষ্ট করিতে হইলেও অল্পদিন মধ্যেই পশার করিয়া ফেলিলেন। মফঃস্বলের হাকিমরা তাহাকে বিশেষ ভয় করিতেন। 'বন্দেমাতরম' মোকদ্দমা ও সন্ধ্যা মোকদ্দমায় কৃতিত্ব লাভ করিবার পরে তিনি আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। আট দশ মাস অবিরত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের ফলে তাহার মুক্তিলাভ করাইতে সমর্থ হন। এই মোকদ্দমায় তিনি বড়ই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। ইহার পরেই ডুমরাওন মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া দেওয়ানী বিভাগেও অপর্য্যাপ্ত যশ অর্জ্জন করেন।

১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত অবিরত ব্যবসায় মনোনিবেশ করিয়া সম্মান ও অর্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিবার পরে, অন্যূন ৭,৫০০০৲ আদালতে জমা করিয়া দিয়া পিতৃদেবকে ঋণমুক্ত করিয়া দেন। ইহারই পরে মা নিস্তারিণী দেবী কার্ত্তিক মাসে ১৯১৩ নভেম্বর পরলোক গমন করেন। মার প্রতি তাহার এত ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল এবং মাও এত

গরীয়সী মহিমাময়ী ছিলেন যে, মায়ের মৃত্যুর পরেই তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মভাব খুব প্রবল হইয়া উঠে।

১৯১৪ সালের জুন মাসে পিতাও পরলোক গমন করেন। ইহার পরেই ১৯১৪ নভেম্বর (১৯২১ অগ্রহায়ণ) তিনি 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এই কাগজেই তাঁহার সেই সময়কার কবিতা, কীর্ত্তন গান, স্তোত্র, প্রবন্ধ ও গল্প বাহির হয়। 'নারায়ণ' দেশের বিশেষ উপকার সাধন করে।

বরাবর চিত্তরঞ্জনের স্বদেশ ভক্তি খুব প্রবল ছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন।

১৯১৭ সালে তিনি ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি হন। এই অভিভাষণ হয় অভিনব রকমের,—দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির কথা ইহাতে দেদীপ্যমান হয়। ১৯১৭ সালের কংগ্রেসে তাঁহার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীগণই প্রবল হইয়া উঠে।

১৯১৮ ও ১৯১৯ সালের কংগ্রেসে তিনিই কংগ্রেসের প্রধান নেতারূপে পরিগণিত হয়েন।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে যে অত্যাচার হয়, তাহাতে তিনি পাঞ্জাবে ৩।৪ মাস উপস্থিত থাকিয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচান্তে পঞ্চনদবাসীদের পক্ষ সমর্থন করেন।

১৯১৯ সালে রিফর্ম্মস্ সংস্কারের প্রবর্ত্তন হইলে প্রথমে তিনি উহার প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন সহযোগিতা করিতে। পরে খিলাফতের প্রতি সরকার অবিচার করায় মহাত্মাজী অসহযোগ প্রথম প্রবর্ত্তন করেন।

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন আইন ব্যবসা একেবারে

ছাড়িয়া দেশের কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই সময় তাঁহার মাসিক আয় ছিল ৫০ হইতে যাট হাজার টাকা।

১৯২১ সালে তিনি যে মহান্ আদর্শ দেখান, সমস্ত ভারতবর্ষ তড়িত স্পৃষ্টের মত জাগিয়া উঠে। ১৯২১, ১৭ই নভেম্বর ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত আগমণ উপলক্ষে কলিকাতা তথা বাঙ্গালায় এমন সুনিয়ন্ত্রিত হরতাল হয় যে গভর্ণমেণ্ট ভলাণ্টিয়ারদের কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য একটি আইন প্রবর্ত্তন করেন। চিত্তরঞ্জন ইহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেন। সমস্ত ভারতবর্ষে এই সত্যাগ্রহে আঠার হাজার লোক জেলে যায়, তন্মধ্যে এক বাঙ্গলা হইতেই ১৬০০০ যায় আর চিত্তরঞ্জন নিজেও কারাবরণ করেন।

ইহার পরে তিনি প্রতিরোধ করিতে কাউন্সিল প্রবেশ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রথমে গয়া কংগ্রেস উহা গ্রহণ না করিলেও দিল্লী ও কোকনদ কংগ্রেস তাঁহার মতানুবর্ত্তী হয়।

পূর্ব্বে [illegible] কাউন্সিল প্রবেশে বাধা দিলেও মহাত্মাজী নিজেই ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসে কাউন্সিল প্রবেশ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক কাজ বলিয়া কংগ্রেসদ্বারা পাশ করাইয়া লয়েন। উভয় পক্ষে গোল মিটিয়া যায়।

অতঃপরে ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে (মে, ১৯২৫) দেশবন্ধু ভারতকে সমান স্বত্ব ও অধিকার লইয়া কমনওয়েলথ অব নেসন্সে থাকিবার আপোষের সর্ত্ত দেন, এবং অকালে তাঁহার পরলোকগমন না হইলে সরকার কর্ত্তৃক তাহা নিশ্চয়ই গৃহীত হইত। সেই সূত্র হইতে এই পচিশ বৎসরে দেশ এক পদও অগ্রসর হইতে পারে

নাই। বরং এত রক্তারক্তি মনোবাদ ও দেশবিভাগ ছাড়া সহজেই তখন কাজ হইত।

উক্ত সম্মিলনীতে মহাত্মার সম্মুখেই তিনি ফরিদপুরে সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন, এবং মহাত্মা তাঁহার প্রত্যেকটি কথা ও যুক্তি গ্রহণ ও সমর্থন করেন।

এই কয়বৎসর দিবারাত্র পরিশ্রমের পর সমস্ত দেশ হইতে জড়তা দূর করিয়া তাহার মতানুবর্ত্তী করিতে সমর্থ হইলেও তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়, তিনি প্রায়ই জ্বরে কাতর হইয়া পড়েন। ফরিদপুর হইতে কলিকাতা আসিয়া দার্জ্জিলিং চলিয়া যান। দার্জ্জিলিংএ মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুর আবাস-স্থান ষ্টেপ এসাইডে ৫ দিন থাকিয়া দেশের যাবতীয় বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন এবং সেইখানে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন সমস্ত দেশকে গভীর বিষাদ সাগরে নিমগ্ন করিয়া ভারতের মুক্তি-পন্থা-প্রদর্শক, বাঙ্গালার দেশবন্ধু হিমালয়চরণে চিরশান্তি লাভ করেন।

সাহিত্য-সাধক চিত্তরঞ্জন

প্রথম অধ্যায়

রাজনীতির ন্যায় সাহিত্য-সাধনাও চিত্তরঞ্জনের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তিনি বরাবর বলিতেন, "আমি আশৈশব সাহিত্য-সেবার চেষ্টা করিয়াছি।" চিত্তরঞ্জন বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। প্রথম হইতেই তিনি কাব্য রচনা করিতেন। যৌবনে দেশী বিদেশী প্রসিদ্ধ সাহিত্য পুস্তকের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তবে একথা সত্য যে, রাজনীতির ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি ততটা সাধন-নিরত থাকিতে পারেন নাই। যদি অক্লান্ত সাধনায় তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে পারিতেন, আমরা সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহাকে পুরোপুরি ভাবেই পাইতাম। তিনি সাহিত্যকে সমগ্র জীবনের অনুভূতি বলিয়াই মনে করিতেন।

কি রাজনীতি, কি সাহিত্য, কি সমাজসেবা, কি ধর্ম্মচর্চ্চা প্রত্যেকটিকে তিনি পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংজড়িত মনে করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "জীবনের প্রত্যেক অংশ তো কবুতরের খোপের মত পৃথক করিয়া ভাগ করা যায় না। সবই

যে একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন ধারা।" তবে দেশ-প্রেমেই (patriotism) ছিল চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তাই তিনি রাজনৈতিক নাও হইতে পারিতেন, সাহিত্যক্ষেত্রেও সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন। কিন্তু যাহাই করিতেন, সমস্ত কর্ম্মপ্রভাবের উৎস হইত স্বদেশ-প্রীতি। আর যাহাই করিতেন, আধা-আধিভাবে করিতেন না, সমগ্র ভাবেই করিতেন। মহাপ্রস্থানের দেড়মাস পূর্ব্বে পাটনা সাহিত্যপরিষদ কক্ষে স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে সভাপতিরূপে তিনি উপস্থিত সাহিত্যিকগণকে এই কথাই বলিয়াছিলেন:—

"আপনারা রাজনীতিক্ষেত্রে আসিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষোভের কোন কারণ নাই। আমিও সাহিত্যসেবায় জীবনাতিবাহিত করিব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম, ঘটনাচক্রেই এক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছি। নতুবা সেই পথই অবলম্বনীয় হইত। কিন্তু অনুশোচনা তজ্জন্য নয়, অনুশোচনা তখনই হইবে, যখন যে কাজেই হস্তক্ষেপ করা যাক্ না কেন, যদি ষোল আনা ভাবে আত্মনিয়োগ না করা যায়। আমি যখনই যাহা করিয়াছি, ষোল আনা ভাবেই করিয়াছি। আপনারাও সাহিত্য-সেবা ষোল আনা ভাবেই করুন, আপনারাও নিশ্চিত ফল লাভ করিবেন।"

সুভাষচন্দ্র বলিতেন, "দেশবন্ধুর জীবনই একখানি মহাকাব্য।" এই মহাকাব্যরূপ চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য-সাধনা যে কিরূপ ছিল এবং সাহিত্যে তাঁহার অবদান যে কতখানি—এখানে তাহাই উল্লেখ করিব।

দেশবন্ধু কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন মাত্র। সেগুলির সংখ্যা খুব কম না হইলেও বেশী কিছু নয়। কাব্য কয়খানি যথা—

১। মালঞ্চ—(১৮৯৬) কবিতাগুলি পূর্ব্বে রচিত, আর ১৩০৩ সালে সাহিত্যপ্রেস হইতে 'সাহিত্য' সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২। মালা—(১৯০২-১৯০৯) পর্য্যন্ত।

৩। সাগর সঙ্গীত—(১৯১০-এ রচিত, ১৯১৩ প্রকাশিত)।

৪। অন্তর্য্যামী—(১৯১৪) "নারায়ণে" প্রকাশিত।

৫। কিশোর কিশোরী—(১৯১৫) "নারায়ণে" প্রকাশিত, উভয়ই পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।

গল্প—

১। 'ডালিম'—(১৯১৪) 'নারায়ণে' প্রকাশিত।

২। 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'—(১৯১৫) 'নারায়ণে' প্রকাশিত।

প্রবন্ধ—

১। কবিতার কথা—(১৯১৪—১৩২১ ফাল্গুন) নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত মুন্সীগঞ্জে পাঠ করেন।

২। "বাঙ্গলার গীতি কবিতা"—(১৯১৬ ডিসেম্বর,) বাঁকীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে পঠিত। 'নারায়ণে' ১৩২৩ পৌষ প্রকাশিত।

৩। "বিক্রমপুরের কথা"—(১৯১৬) ডোমসার, বিক্রমপুর সম্মিলনীর সভাপতিরূপে পঠিত।

৪। "রূপান্তরের কথা"—(১৯১৭ ফেব্রুয়ারী) সরস্বতী ইনষ্টিটিউ-টের অধিবেশনে পঠিত। মুদ্রিত চৈত্র—১৩২৩।

৫। "বাঙ্গলার কথা"—(১৯১৭ মে) প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ।

৬। "বাঙ্গলার গীতি কবিতা"—(১৯১৭) দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত—১৩২৪, অগ্রহায়ণ।

৭। "বৈষ্ণব কবিতা"—(১৯১৭) উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্বাম অধিবেশনে পঠিত, মুদ্রিত—১৩২৪, পৌষ।

৮। "স্বাগত"—(১৯১৮) ঢাকায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, মুদ্রিত ১৩২৫ বৈশাখ।

৯। "বাংলার গীতি কবিতা"—(১৯১৮) তৃতীয় ভাগ ১৯২৫ এপ্রিল মাসে সংশোধিত এবং ১৯৩৪ সালে শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত। প্রবন্ধটির বিশেষ নাম—"শক্তি-সাহিত্যে ধারায় রামপ্রসাদ"।

১০। "বাঙ্গলার কথা"—(১৯২১ সালে) সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা ও তাহাতে তাঁহার অসংখ্য স্বদেশী বিষয়ক প্রবন্ধ।

১১। "বঙ্কিম-সাহিত্য"—(১৯২৪) কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্য-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

এতদ্ব্যতীত কয়েকটী কীর্ত্তন সঙ্গীত তিনি রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলিও "নারায়ণে" প্রকাশিত হয়। এই নারায়ণ 'মাসিক' পত্রিকাও ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং চিত্তরঞ্জনই ইহার সম্পাদনা এবং ব্যয়ভার বহন করেন। এই তালিকা সামান্যই হউক বা বড়ই হউক "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। আমরা এই সমস্ত কবিতা ও প্রবন্ধে কোন সারবস্তু পাই কি না, তাঁহার সাহিত্যে জাতির ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইয়াছিল কি না, এই প্রবন্ধের তাহাই আলোচ্য বিষয়।

এই আলোচনার পূর্ব্বে আরও কয়েকটী সামান্য সামান্য বিষয়ের উল্লেখ করিব। বরাবর তিনি সাহিত্য সভায় এবং মাসিক পত্রিকায় অকাতরে সহায়তা করিয়াছেন। অধ্যাপক স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত লিখিয়াছেন—"মানসী পত্রিকা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতেন। যে কয়জন উদ্যমশীল সাহিত্যরসিক যুবক

নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়া 'মানসী' পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিতেন তাহাদের কাহারই অর্থস্বচ্ছলতা বেশী ছিল না। অধুনা-লুপ্ত হগলিং কোম্পানীর দ্বিতলের একটি ঘরে ইহার কার্য্যালয় ছিল। চিত্তরঞ্জন মাসে মাসে ৫০৲ টাকা করিয়া 'মানসী'র জন্য দিতেন, তা ছাড়া এককালীন বেশী টাকাও দান করিয়াছেন। একবার ম্যানেজার যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'মানসী'র জন্য দুই হাজার টাকা আনিয়াছেন, তখন ইহা ঋণ বলিয়াই লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু এ ঋণ আর শোধ করা হয় নাই। এই 'মানসী' ও 'মর্ম্মবাণী'ই সম্মিলিত হইয়া নাটোরের মহারাজা স্বর্গীয় জগদীন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। অধুনা ইহা বিলুপ্ত।

'সাহিত্য' পত্রিকাকে ঋণ হইতে বাঁচাইবার জন্য তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। আর একখানি মাসিক পত্রিকা "নির্ম্মাল্য" মনোহর পুকুর রোডস্থ একটী বাড়ী হইতে রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। 'নির্ম্মাল্য'এ চিত্তরঞ্জনের অনেক কবিতা বাহির হইয়াছিল। এই মাসিকপত্র পরিচালনের আবশ্যকীয় খরচ চিত্তরঞ্জনই বহন করিতেন এবং সাহিত্যসেবী রাজেন্দ্রবাবুকেও নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। যৌবনাবস্থা হইতেই সাহিত্য-প্রীতি যে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, সে বিষয়ে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের কয়েকটি কথা এখনও কাণে বাজিতেছে—

"...তখন আর একজন সাহিত্যের উদ্যোগী, হিতৈষী কর্ম্মী ছিলেন। তিনিও বিলাতে যান। সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে সাহিত্যের জন্য পদ্য, গান রচিয়া, এডেন হইতে, সুয়েজ হইতে, মার্সাই হইতে ডাকে দিয়াছেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া মালঞ্চে ফুলের চাষ করিয়াছিলেন। তার পরে আইনের গোলকধাঁধার প্রবেশ করেন। তাঁহাকেও এতদিন পরে রোগে ধরিয়াছে। পরিণত বয়সে 'সাগর-

সঙ্গীত' শুনিয়া শঙ্খের মত সমুদ্রের আরাব ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, দেশে আনিয়াছিলেন। চব্বিশ পঁচিশ বৎসর তিনি নারায়ণের চরণে সোণার তুলসী দিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা সফল হউক।"

"সেকালের স্মৃতি" "বাজে কথা" (১৩২১ মাঘ) "নারায়ণ"।

বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন এবং স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় একত্র সাহিত্যানুশীলন করিতেন। চিত্তরঞ্জন বিলাতেও একখানি ইংরাজী নাটক লিখিয়া স্যার হেনরী আর্ভিং দ্বারা প্রশংশিত হন। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল যে, আলোচনার সময় বৈষ্ণব কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম, গিরিশ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি ও প্রবন্ধলেখকের কত জায়গা হইতে আবৃত্তি করিয়া ঠিক ঠিক ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। মনে হইত বাঙ্গালাসাহিত্যই যেন একেবারে তাঁহার কণ্ঠস্থ। যৌবনে সর্ব্বাপেক্ষা বঙ্কিমের সাহিত্যেরই তিনি সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। "কমলাকান্ত" ছিল তাঁহার মুখাগ্রে, প্রবন্ধগুলির তিনি প্রায়ই আলোচনা করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "বঙ্কিমের অসাধারণ কবিত্বের একটা উদাহরণ দিতেছি। কমলাকান্ত একটি গীত গাহিতেছেন—

"এসো, এসো, বঁধু এসো
আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি"।

কমলাকান্ত আক্ষেপ করিতেছে, "হায় কিসেই বা নয়ন ভরিবে? নয়নে যে পলক আছে।" চিত্তরঞ্জন বলেন, "এখানে বঙ্কিমবাবুর কবিত্ব অতি অসাধারণ রকমের! এরূপ ভাব অল্প কবিতায় দেখিয়াছি।"

ইংরাজী সাহিত্যে তিনি সুইনবার্ণ, ব্রাউনিং, এমার্সন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ খুব পছন্দ করতেন। বিলাতে অনেক পয়সা খরচ করিয়া ইংরাজী সাহিত্য কিনিয়া আনিতেন। ব্রাউনিং-এর তিনি একান্ত ভক্ত ছিলেন! ব্রাউনিং-এর অনেক কবিতা মুখস্থ ছিল। ব্রাউনিং পড়িবার সময়ও স্থান কাল ভুলিয়া যাইতেন; রাজনৈতিক কোলাহলের সময়ও একদিন রাত্রি এগারটার সময় ব্রাউনিং-এর কথা উঠিলেই তিনি তখনই পুস্তকখানি আনাইয়া ভাবের সহিত উহা পড়িতে লাগিলেন, শ্রোতা বন্ধুবর সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (পরে President, Bengal Legislative Council)। অল্পক্ষণ পরেই সত্যেন্দ্রবাবুর চক্ষু নিদ্রায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। চিত্তরঞ্জনের পড়া শেষ হইল রাত্রি একটার সময়। তিনি সত্যেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া উঠাইলেন, বলিলেন, "তুমি যে কখন ঘুমাইয়াছ, আমি টেরই পাই নাই।"

সাহিত্য সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের রহস্যালাপও ছিল সাহিত্যিকের ন্যায়ই অভিনব রকমের। কীটসের কবিতায় একটী পদ আছে—

A thing of beauty
is a joy for ever.

একদিন স্বর্গীয় ডাক্তার হরিধন দত্ত মহাশয় কর্পোরেশনের আফিসে আসিয়াছেন। দেশবন্ধু তখন মেয়র হইয়াছেন। আর হরিধনবাবু তখনও চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসারই আছেন। মেয়রের গৃহে একখানি টেবিল দেখিয়া ডাঃ দত্ত বলিলেন:—

টেবিলখানা তো বড়ই সুন্দর!

দেশবন্ধু—হাঁ বেশ।

মিঃ দত্ত আবার বলিলেন, টেবিলখানি ভারী সুন্দর, "It is a thing of beauty".

দেশবন্ধুও কীটসের কবিতা আওড়াইয়া অমনি উত্তর করিলেন—
But to me it is not a joy for ever.

বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্বন্ধেও এইরূপ রহস্যালাপ হইত। নাট্যাচার্য্য অমৃত বসু মহাশয়ের "খাস দখলের" একজায়গায় আছে যে, কোন ডাক্তার পায়ে ষ্টকিং না দিয়া লোকেনকে দেখিতে আসায় তাহার তথাকথিত শিক্ষিতা স্ত্রী মোক্ষদা ১৬৲ টাকা ফি হইতে ৬৲ টাকা কাটিয়া দিতে বলে। মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে ১৯২৫ সালে পাটনায় হঠাৎ একদিন রক্তামাশায় হওয়ায় পরামর্শ হয় যে, তবে ডাক্তার নীলরতন সরকার বা বিধান রায়কে চিঠি লিখে দেওয়া হউক।' দেশবন্ধু তৎক্ষণাৎই উত্তর করেন—

"কেন, সান্যাল ম'শায় কি পায়ে ষ্টকিং দেন না বলে?"

পাটনার ডাঃ এস, পি, সান্যাল ছিলেন তাঁহার ব্যক্তিগত চিকিৎসক।

এইরূপ সাহিত্য সংক্রান্ত আলাপ তিনি বড় বড় সভায়ও করিয়াছেন। কাউন্সিল গৃহে শেষ বক্তৃতার সময়ও কাউন্সিল ভাঙ্গিবার প্রসঙ্গে বলেন, "কৃষ্ণ দর্শনের ফল কৃষ্ণদর্শন"। জুরী বা এসেসারদের কাছে তাঁহার অভিভাষণেও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। অরবিন্দ বাবুর মোকদ্দমায় এবং ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় জাতীয় ও ধর্ম্মমূলক সাহিত্যের ক্রম বিকাশের ধারা খুব প্রাঞ্জলভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "বাংলার সম্পদ বাঙ্গলা ভাষা। কি রকম ক'রে কথার বিবর্ত্তন হয়েছে, সব সংগ্রহ করা দরকার। অন্য ভাষা থেকে যে সমস্ত কথা ঢুকেছে, তার অর্থের পরিবর্ত্তন অন্যান্য ভাষায় কি রকম ব্যবহার হয়েছে, বিভিন্ন লেখকেরা কি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন, ইত্যাদি একখানি বইতে থাকা আবশ্যক।" এই

সম্বন্ধে মহিলা কবি স্বর্গীয়া গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর পুত্র প্রকাশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে কথা হয়। প্রকাশবাবু বলেন—

"Rhyme এর একটা dictionary কল্লে ভাল হয় না ?"

চিত্তরঞ্জন—বাঙ্গলায় rhymeএর dictionary ? সর্ব্বনাশ, একেই তো মিলের জ্বালায় অস্থির। তবে আপনাকে একটা কাজ কর্ত্তে হবে। যেমন 'ভামিনী' কথার কত রকম অর্থ ? কে কোন্ রকমে ব্যবহার করেছে, কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে, ইত্যাদি।

দেশবন্ধু এইরূপ একখানি অভিধান প্রণয়ন করিতে 'ক' হইতে 'চ' পর্য্যন্ত অগ্রসরও হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই সমস্তই 'এহো বাহ্য'। আমরা এবার এই সকলের মধ্যের সারতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই "মালঞ্চের" কথা বলিতে হয়। চিত্তরঞ্জন হৃদয়-কানন-প্রস্ফুটিত নানা কবিতা-কুসুমে মালঞ্চ সাজাইয়াছেন—

"গাহে পাখী বহে বায়ু বসন্তের মত
নানাবর্ণে শত পুষ্প ফুটে মন-বনে
এই মালঞ্চে।"

'প্রেম', 'বাণী' 'আমার ঈশ্বর', 'স্বপ্ন', 'প্রাণের গান' 'অহঙ্কার' 'আকাঙ্খায়', 'ঈশ্বর', সুখ, স্মৃতি, চিরদিন, সে, জোছনা, সোঽহং, 'সাগরে', 'সাগরতীরে', 'লালসা', 'মৌন', 'ধার্ম্মিক', 'অভিসার', 'বারবিলাসিনী', 'উষা', 'ওফেলিয়া', 'কল্পনা', 'সুখ', 'দুঃখ', 'জীবনের গান' প্রভৃতি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। কবিতাগুলিতে বিখ্যাত কবি সুইনবার্ণ এবং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়, এবং চিত্তরঞ্জন তাহা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। চিত্তরঞ্জন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের "খামখেয়ালী" ক্লাবের সভ্য ছিলেন, এবং প্রায়ই কবি দ্বিজেন্দ্র লাল, অতুলপ্রসাদ, কবি সুধীরেন্দ্র

নাথ ঠাকুর ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে তিনি নিত্য নূতন নূতন খামখেয়ালী পোষাকে এই বৈঠকে যোগদান করিতেন। এবং একে অন্যের কবিতা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। যাহাহউক মালঞ্চের কবিতাগুলি বড় সহজ ও সরলভাষায় সুরচিত এবং উহার প্রত্যেকটী কথার সহিত কবির সম্পূর্ণ প্রাণের যোগ দৃষ্ট হয়। 'মালঞ্চ' চিত্তরঞ্জনের বিবাহের ২।১ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

এই সময় "মালঞ্চ" শিক্ষিত মহল এবং ব্রাহ্ম সমাজে বড়ই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলে হইয়াও একান্নভুক্ত পরিবারে প্রতিপালিত, আর নিজের বাড়ীতেই হিন্দু আচার ব্যবহারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সুপরিচিত ছিলেন। এদিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার চিত্তের প্রসারতা তাঁহাকে আবার কোনও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি নির্ভীকভাবে ব্রাহ্মসমাজের দোষগুণের আলোচনা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও চিত্তরঞ্জন এই সময় হারবার্ট পেন্সারের Agnisticism এর অজ্ঞেয়তাবাদের অনেকটা অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বরের নাম করিলেও ঈশ্বরের কারুণ্য সম্বন্ধে তিনি খুবই সন্দিহান ছিলেন, এবং সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের পরমতত্ত্ব তখনও তাঁহার নিকট unknown- এবং unknowable ছিল বলিয়াই মনে হয়। তাই তিনি "মালঞ্চে" একটী কণ্টকময় পুষ্পরচনা করিয়া বলিতেছেন—

"ঈশ্বর। ঈশ্বর। বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি গগন ভরিয়া,
আমাদের সুখশান্তি নিতেছে হরিয়া
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন।
জীবন—যাতনা তরে সজল নয়ন
জুড়াইতে চাই হৃদে ঈশ্বর খুঁজিয়া

আপনার হৃদয়ের ধূমরাশি দিয়া,
'সত্য বলে' পূজা করি অলীক স্বপন।
হায়, হায়, মিথ্যা কথা, ঈশ্বর! ঈশ্বর!"

এই স্থানেই ব্রাহ্মসমাজের মতবাদের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের বিদ্রোহ প্রকট হইয়া উঠে। এবং এই বিরুদ্ধ মত তিনি বুকের ভিতর হৃদয়ে পোষণ না করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করায়. সেই বিরোধিতা সাধারণে আলোচিত হইয়া আরও প্রবল ভাব-ধারণ করে।

তৃতীয়তঃ, তিনি মনে করিতেন যে, ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকগণ অথবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মনে মুখে একরূপ নহেন। তাঁহারা মুখে ধর্ম্ম এবং ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করিলেও অন্তরে খুব উদার নহেন। এইরূপ ভাব তিনি একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছেন। বরং তিনি ভগবানের অসীম শক্তির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিতেও প্রস্তুত, তথাপি এই সমস্ত অহঙ্কারী ধর্ম্মধ্বজ ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার কোনও বিশ্বাস নাই। তাই তিনি বলিতেছেন—

"অসার সকল জ্ঞান; ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী।
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার?
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্ত্রবাণী
আপনার মনে আনে মোহ অন্ধকার;
ক্ষুদ্র তুমি ক্ষীণপ্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্তশক্তি মহাদেবতার,—
এ শূন্য বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে
বৃথা বহ আপনার পুষ্প অর্ঘ্যভার!"

"সোঽহং।"

অন্যত্র তিনি এইরূপ ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের কপটতা আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন:

"সুধাও ধর্ম্মের কথা দিবস রজনী
সাক্ষী দিয়া ঈশ্বরের কথায় কথায় :
বক্তৃতা শুনিয়ে শুধু স্তম্ভিত অবনী
আহা ! আহা ! বলি তব চরণে লুটায়
ধরণীর সুখ দুঃখ অবহেলা করি,
আঁকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া
নিমিষে নিঃশ্বাস ফেলি ভগবান স্মরি'
মানবের শতপাপ দাও দেখাইয়া।

ওহে সাধু। আমি জানি অন্তর তোমার
ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায়,
ধরণীর করতালি উৎসাহ অপার
গুঞ্জরে শ্রবণে শত মধুপের প্রায়।
এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
কাজ কি এ মিথ্যাভরা দেবতার ভাণ।"

আজীবন চিত্তরঞ্জন ছিলেন বিদ্রোহী, তাঁহার হৃদয়ের ভাবের সহিত কোন মতবাদের সামঞ্জস্য না থাকিলে তিনি উহার বিরোধিতা করিতে কখনও পশ্চাদ্পদ হন নাই। পূর্ব্বে ম্যাক্লিনের ন্যায় সঙ্কীর্ণমনা ব্রিটনবাসীর অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করিয়া Heaven-born service এর লোভ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবার ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়া সেই সমাজে অচল হইলেন।—ইতিমধ্যে একদিন কোন প্রবীণ প্রচারক ভুবন বাবুর বাড়ী আসিয়া চিত্তরঞ্জনকে পেগ সেবনে রত দেখিয়া মর্ম্মাহত হ'ন। এবং তাহাকে দেখিয়াও সুরাপাত্র গোপন না করিয়া চিত্তরঞ্জন পূর্ব্ববৎই উহা পান করিলেন দেখিয়া তিনি বিরক্তির সহিত চলিয়া যান। ঐরূপ রচনা এবং তাহার সম্মুখে মদ্যপান!

প্রচারক মহাশয় মনে করিলেন, "চিত্তরঞ্জন ইচ্ছা করিয়াই আমাদিগকে অপমানিত করিতেছে"। ব্রাহ্ম সমাজেও এই কথা প্রচারিত হইল। আবার বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সমাজের সভাপতিই ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দুর্গামোহন ও তাঁহার পিতা ছিলেন অন্যতম সভ্য। অবশ্য দুর্গামোহন তখন প্রায় শয্যাশায়ী থাকিতেন। ভুবনমোহন ও কচিৎ সমাজের উপাসনায় যোগদান করিতেন। ব্রাহ্মগণের বিচারে চিত্তরঞ্জন দুর্নীতিপরায়ণ সাব্যস্ত হইলেন, তাঁহারা তাঁহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিলেন।

ব্রাহ্মদের বিরক্তির আরও একটী কারণ আবিস্কৃত হইল,—চিত্তরঞ্জনের কবিতা কুরুচি-প্রবণ মনে করিয়া তাঁহারা ইহার বিশেষ নিন্দাপ্রচার করেন। অন্ততঃ চিত্তরঞ্জনকে হেয় করিবার ইহাই তাঁহাদের প্রধান আয়ুধ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহারা কয়েকটী কবিতায় যৌবনের উদ্দামতা, অতৃপ্ত আকাঙ্খা, সুখলিপ্সা, ভোগ-বাসনা এবং রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহায়তায় জীবনের সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার দুর্দ্দমনীয় কামনা স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট—উল্লেখ করিয়া সেই নিন্দাবাদ প্রচারে আরও সহায়তা পান। বিশেষতঃ তাঁহাদের বিবেচনায় সাব্যস্ত হইল যে, চিত্তরঞ্জন "বারবিলাসিনী" কবিতাটিতে কামকলাকে মোহিনী সাজে লোকচক্ষুতে সুসজ্জিত করিয়া মানুষের রক্তমাংসের প্রেরণা উদ্দীপিত করিয়াছেন। যেমন, 'বারবিলাসিনী' বলিতেছে :—

"রঞ্জিয়াছি অধর আমার।
কোমল বিচিত্র রাগে
আমার অধরে জাগে
রক্ত-আভা ; কেশে পুষ্পসার—
চঞ্চল কুন্তলে—মধু পুষ্পসার
রমণীর অধর আমার!

এসো পান্থ! ভ্রমিয়া ধরণী
হেথা আজ আঁধিয়া রজনী
অবগাহ প্রেমে মোর আজি এ রজনী
এসে পান্থ ভ্রমিয়া ধরণী!

অধর-চুম্বন কর পান!
তরঙ্গিত তনু ভ'রে
সব মধু লও হ'রে
আছে যত পুষ্প হাসি গান!"

কিন্তু তাহারা ভাবিতেও পারেন নাই যে, মালঞ্চের ইহা বহিরাবরণ মাত্র—

"তোমরা দেখছি শুধু বাহিরের সাজ
সৌন্দর্য্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের।"

ভাবিবার অবকাশ পান নাই যে, কবি সমগ্র কবিতাটীতে পতিতা নারীর হৃদয়ের জ্বালা কিরূপ মর্ম্মান্তিকভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী প্রতিছত্রে পতিতার প্রতি চিত্তরঞ্জনের অবিমিশ্র সহানুভূতিই পরিস্ফুট হইয়াছে। সে সময়ে সমাজের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর দুর্দ্দশা পুরুষের প্রলোভন এবং প্ররোচনায়ই সংঘটিত হইত, কিন্তু পুরুষের অন্যায়ের কথা সকলেই ভুলিয়া যাইত, আর নারী থাকিত অনাদৃতা, বিদ্রূপাহতা, সমাজ-পরিত্যক্তা। এই উপেক্ষিতা নারীর অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনিই কবিতাটিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন—

"তাই ব'লে নারীর নারীত্বটুকু, সে কি শুধু কথার কথা?"

গিরিশচন্দ্রও 'বারাঙ্গনা' কবিতায় উহাদের প্রাণের কথাই প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন :—

"শ্মশান আমার প্রাণ
রমণী হৃদয় আমি দিছি বলিদান।"

কবি চিত্তরঞ্জনও তাহাদের প্রাণের ব্যথাই প্রাণ ভরিয়া ছন্দে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন—

"নাহি স্মৃতি জীবন ব্যাপিয়া
নাহি কোন অনুতাপ
প্রাণময় পরিতাপ
যদি আসে, ফিরাই হাসিয়া
কোথা স্মৃতি জীবন ব্যাপিয়া।"

পরবর্ত্তী কয়পংক্তিতে অভাগিনী যেন হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—

"যাহা আছে, সব লও তুলে।
রেখে যেয়ো রক্তজ্বালা
তুলে নিও পুষ্পমালা
রজনী প্রভাতে যেয়ো ভুলে—
অন্ধ নিশি শেষ হ'লে সব যেয়ো ভুলে,
আমার সকলি লও তুলে।"

আর নারীরই যে সব দোষ, সেই মাত্র কলঙ্কিনী, পুরুষের কোনরূপে দেবকার্য্যেও বাধা নাই, এই কথাই সে পরিস্ফুট করিয়াছে—

"তুমি যেয়ো এলে উষারাণী
পুণ্য দেহে শুভ্রহাসে
পশিও পবিত্রবাসে
রজনার কলঙ্কের বাণী

ভুলে যেয়ো রজনীর কলঙ্কবাহিনী
শুধু আমি রব কলঙ্কিনী—

কবি চিত্তরঞ্জনের প্রাণের দরদ নিয়ে কবিতা কলিতে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে :—

আমি যেন চিরদিন ঋণী
অপার ঐশ্বর্য্য লয়ে
বিলাই ভিখারী হ'য়ে
বাসনাবিহীন উদাসিনী
কে করেছে মোরে চিরঋণী? *
ওগো আমি যৌবনে যোগিনী
এ-বিশ্বলালসা ছাই
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তাই
চলিয়াছি কলঙ্কবাহিনী
চিরদিন যৌবনে যোগিনী।

ইহাপেক্ষা নিজের মানসিক জ্বালা ব্যক্ত করিবার ভাষা কোথায়? কিন্তু তথাপি এই বারবিলাসিনী পুরুষকে কোনরূপ নির্দ্দয় বাক্যে

---

* রবীন্দ্রনাথের 'পতিতায়' আছে :—

"হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয় ভেরী
জননীর স্নেহ রমণীর দায়
কুমারীর নব নীরব প্রীতি।
আমার হৃদয় বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।"

কাহিনী—৯, কার্ত্তিক ১৩০৪

আগত করে নাই, সে কেবল আত্মকৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়েই অকপটে কাঁদিয়া জানাইতেছে—

"কার অভিশাপে নাহি জানি
কোন্ মহাপ্রাণে ব্যথা
দিয়াছিনু, তাই হেথা
প্রাণহীন প্রেম-বিলাসিনী
সবারে বিলাসী তাই বারবিলাসিনী
তারি শাপে চির-কলঙ্কিণী।"

যাহা হউক "বারবিলাসিনী" কবিতায়ও কবি চিত্তরঞ্জন টমাস হুডের কবিতার দ্বারাই যে প্রভাবিত হইয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এবং ব্রাউনিং এবং হুড্ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন যে মত পোষণ করিতেন পাঠকের তাহা গোচরীভূত করা উচিত। ১৯১৫ সালে চিত্তরঞ্জন ভাগলপুর একটি বড় মোকদ্দমা করিতে গিয়া অনেক দিন ছিলেন। সেইখানে, অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সুধাংশুভূষণ রায়, ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ও যতীনাথ ঘোষ প্রভৃতির সহিত সাহিত্য বিষয়ে প্রতিদিন বৈকালে আলোচনা করিতেন। অধ্যাপক সেন লিখিয়াছেন (বঙ্গবাণী, ১৩৩২, আশ্বিন, পৃ ২৩৪-২৩৫)

"ইংরাজ কবিদের মধ্যে ব্রাউনিং ছিলেন তাহার প্রিয় কবি। ব্রাউনিংয়ের কবিতা পড়া হইত। তাঁহার সবচেয়ে ভাল লাগিত One word more কবিতাটি। কবি এই কবিতাটি লিখিয়া তাঁহার Man and woman নামক কাব্যখানি পত্নীর করে অর্পণ করেন। ইহাতে কবির স্বীয় দাম্পত্য প্রেম জলন্ত ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জনের মুখে এই কবিতাটির প্রশংসা ধরিতনা। তিনি বলিতেন যে জগতের সাহিত্যে এমন সুন্দর প্রেমের কবিতা আর নাই। অন্যান্য কবিতা লইয়াও আলোচনা হইত। The Statue and the

Bustএর অন্তর্নিহিত শিক্ষা যে কয়ছত্রে প্রকটিত তাহা আবৃত্তি করিয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন And the sin I impute to each frustrate ghost was the unlit lamp and the ungirt loin. মানুষ যখন মনে মনে পাপ করিয়া সুযোগের অভাবে তাহার পাপ কামনা চরিতার্থ করিতে না পারে তখন তাহার সেই কাপুরুষতা যে তাহাকে আরও বেশী ঘৃণ্য করিয়া তুলে, ইহাই হইল কবিতাটির শিক্ষা। সম্ভ্রান্ত বংশের বিবাহিতা নারী পর-পুরুষের সহিত আসক্তা হইয়া স্বামীর কড়া পাহারায় প্রণয়ীর সহিত মিলিত হইতে পারিল না, কিন্তু সে তাহার প্রাণের আশা ও কামনা লইয়া গবাক্ষ হইতে রাজপথের পানে চাহিয়া থাকিত। কখন তাহার প্রণয়ী তাহার 'সম্মুখ দিয়া স্বপন সম' অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে তাহার দিকে একবার প্রেমপূর্ণ নয়নপাত করিবে! পুরুষটিরও অবস্থা তাহারই মতন। তাহারও এমন মনের জোর নাই যে, সে তাহার অভীপ্সিত বস্তু বলপূর্ব্বক লাভ করিতে পারে। ফলে, দিনের পর দিন এই মূক প্রেমাভিনয় চলিতে লাগিল—গবাক্ষ-পার্শ্বে উৎসুক রমণীমুখ আর তাহারই সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে অশ্বারোহণে একটি পুরুষের গমন। ক্রমে তাহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সহরের লোকের নিকট এই দুই নরনারীর প্রণয় কাহিনী অজ্ঞাত ছিলনা। উভয়ের মৃত্যুর পর তাহারা সেই গবাক্ষপার্শ্বে রমণীটির আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি ও তাহার সম্মুখস্থ পার্কে পুরুষটির অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি এরূপভাবে স্থাপিত করিল যেন দুইজন উৎসুকভাবে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া আছে। নীতিবাগীশদিগের মধ্যে ব্রাউনিংএর এই কবিতাটি ঘোর দুর্নীতিমূলক বিবেচিত হইয়াছে এবং জীবদ্দশায় এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন কবির বিরুদ্ধে এই দুর্নীতির

অপবাদ অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন এবং কবিতাটির যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতেন। এ সম্বন্ধে আমরাও তাহার সহিত একমত ছিলাম। সমাজের চক্ষে যাহা পাপ তাহাতো এই দুই নরনারীর মন ঘোরতর পাপে কলুষিত করিয়াছেই। শুধু সুযোগ বা সাহায্যের অভাবে যদি তাহারা স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই সংযমের মূল্য কি ?

'ব্রাউনিংএর Andrea Del Sarto, Fra Lippo Lippi প্রভৃতি কবিতাও তিনি বিশেষ উপভোগ করিতেন—এই সব কবিতায় মানব চরিত্রের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণের জন্য Evelyn Hope নামক কবিতাটি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু যে কবিতাটি তাহার হৃদয়-মন করুণা-ধারায় সিক্ত করিয়া দিত তাহা হইতেছে হুডের the Bridge of Sighs, পতিতাদিগের দুর্দ্দশার জন্য সমাজের দায়িত্ব যে বড় কম নয় এবং এই হতভাগিনীকে ঘৃণা করিবার অধিকার যে আমাদের কাহারও নাই, এই কথাই তিনি উক্ত কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিতেন। তাঁহার যৌবনে রচিত মালঞ্চ কাব্যের 'বারাঙ্গনা'ও অতি করুণ ভাষায় স্বীয় মর্ম্মব্যথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

রেখে যেও রক্তজ্বালা
তুলে নিও পুষ্পমালা
রজনী প্রভাতে যেয়ো ভুলে

জানি-না, এই কারণেই তিনি ঠিক সেই সময়ে তাঁহার নারায়ণে বারাঙ্গনা চরিত অঙ্কিত করিতেছিলেন কিনা। এজন্য তাহাকে যথেষ্ট নিন্দাভোগও করিতে হইয়াছে।"

এখন "Bridge of Sighs"এর কথাটুকু খুলিয়া বলি। চিত্তরঞ্জন হুডের এই প্রসিদ্ধ কবিতাটিতে সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া

শিহরিয়া উঠিতেন। চার্লস ডিকেন্সের Threatening letter to a youngman কাহিনীতে আছে একটি নিরুপায়া যুবতী নিজেই জামা তৈয়ার করিয়া এক একখানি সাড়ে তিন পেনিতে বিক্রী করিয়া উহাতে নিজের ও কন্যার জীবিকার সংস্থান করেন। একদিন তাহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ও সরঞ্জামাদি সবই অপহৃত হয়। রমণী আর কি করিবেন তাঁহার আর কোন সম্বল নাই, সাহায্য পাওয়া যায়না, ভিক্ষা কেহ দেয়না। তাই সে কন্যাসহ জলে ডুবিয়া মরিতে উদ্যত হইলে একজন আসিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে উদ্যত হয়। তিনি রক্ষা পান বটে, কিন্তু মেয়েটি আর কিছুতে বাঁচিল না। আদালতে রমণীর বিচার হইল এবং বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। টমাস হুড এই গল্প পড়িয়া এতই মর্ম্মাহত হন যে তাহার উক্ত কবিতায় একটী পতিতা রমণীর সম্বন্ধেও এইরূপ লেখেন। কবিতার মর্ম্ম এই কোন এক কামুক পুরুষ মধুরবাক্যে এক রমণীকে প্রলোভিত করিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। পুরুষটী আসে যায়, প্রেমাভিনয় করে, কিন্তু রমণীর গর্ভসঞ্চার হইতেই চম্পট দেয়। হতভাগিনীর লজ্জার পরিসীমা রহিল না এবং একটি মেয়ে প্রসূত হইলেই সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল। রমণীর আর কোথাও স্থান হইল না, অবশেষে সে কন্যাসহ জলে ডুবিয়া মরিতে বদ্ধপরিকর হয়। এই ক্ষেত্রেও মেয়েটিই মারা পড়ে কিন্তু মায়ের কঠোর প্রাণ রক্ষা হয়। এখানেও বিচারে তাহার ফাঁসির হুকুম হয়।

Bridge of Sighsএ পতিতার এই মর্ম্মান্তিক ব্যথাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবং সেই প্রভাবেই চিত্তরঞ্জন পতিতার মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। হুড প্রাণস্পর্শী ভাষায় উক্ত কবিতায় লেখেন—

Weary with the troubles
The death must deliver

Once more life, bubbles
Away in the river.

The moon in the river shone
And the stars some six or seven
Poor child of sin, to throw it there'in
Seemed sending it to Heaven

Cover her cover her
Throw the earth over her.
Touch her not scornfully
Think of her mournfully
Gently and humanly
Not of the stains of her
All that remains of her
Now is pure womanly.
Make no deep scrutiny
Into her mutiny—
Rash and undutiful
Past all dishonour
Death has left on her
Only the beautiful.

'বার বিলাসিনী' কবিতা পড়িয়াও মনে হয়—সব ছাড়িয়া দিলেও এই একটী কবিতায়ই মরমী চিত্তরঞ্জনের কবি-যশ বাঙ্গলা ভাষায় অমর হইয়া থাকিবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মহাকবি

গিরিশচন্দ্রের 'সোণা' ও 'কাদম্বিনী' চরিত্র ব্যতীত এরূপ দরদের পরিচয় আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয়। এই সহানুভূতি চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে বারবার লক্ষ্য করিয়াছি। ১৯১৯ সালের একটী কথা মনে পড়িতেছে। মনোমোহন থিয়েটারে সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা ও অভিনেত্রী যাদুমণির স্মৃতিসভা বসিয়াছে। চিত্তরঞ্জনই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। একজন বক্তা বলেন, "কেন অনেক লোক আজ এই সভায় আসে নাই ? আমরা কি তার অন্যায়টুকু ক্ষমা করে গুণের মর্য্যাদা দেখাতে পারি না?" চিত্তরঞ্জনের প্রাণে ইহাতে বড় ব্যথা লাগে। তিনি অভিভাষণে বলেন, 'যারা আসেন নাই, তাদের চেয়ে এই বক্তা যাদুমণির স্মৃতির উদ্দেশে কম অশ্রদ্ধা দেখান নি। ক্ষমা করতে পারি এরূপ দম্ভের কথা আমি কল্পনাও কর্ত্তে পারি না। আমাদের কেবল লোককে সহানুভূতি করার ও ভালবাসারই অধিকার আছে। ক্ষমা বা ঘৃণা করতে পারি এরূপ কথা মুখে আনাও পাপ।"

যে বেদনা, দরদ ও সহানুভূতি লইয়া চিত্তরঞ্জন বরাবর আপামর সাধারণকে ভালবাসিতেন, তাহার উন্মেষই 'মালঞ্চে'। হুডের ন্যায় তিনিও মনে করিতেন, পতিতাদের ঘৃণা করিবার অধিকার কাহারও নাই এবং তাহাদের দুর্দ্দশার জন্য সমাজের দায়িত্বই বরং বেশী।

প্রকৃত আর্ট তাপিত, পতিত, শোকার্ত্ত ও নিরন্নের প্রতি সহানুভূতিতে নষ্ট হয় না। বরং অপরাধের প্রশ্রয় না দিয়া অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিতে আর্টের পরিকল্পনা আরও মহত্তর হইয়া উঠে। এইরূপ সহানুভূতি চিত্তরঞ্জনের গল্প "ডালিম" এবং "প্রাণপ্রতিষ্ঠার" আশালতাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ডালিম বলিতেছে :

"তারপর—এখন আমি কলকাতার ডালিম। আমার সুখের শেষ নাই। সহরের বড় বড় লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়। আমার বাড়ীতে সাজসজ্জার অভাব নাই। সোণার খাট, হীরার

গহনা। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক বাতি, ইলেক্‌ট্রিক পাখা, দাস-দাসীর অন্ত নাই, আলমারী ভরা কাপড়, বাক্স ভরা টাকা…

কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছি, বুক যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়! আমি নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি…"

আশালতাও বলিতেছে—

"আমি কলঙ্কিনী, পাপিষ্ঠা, আত্মঘাতিনী।"

আর্টের দিক হইতে তাঁহার স্থান বিচার করিবেন সমালোচকগণ, কিন্তু একথা বলিতে পারি যে হৃদয়ের দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে বিংশ শতাব্দীতেও চিত্তরঞ্জন সমকক্ষ কবির সংখ্যা কম একথা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যাইতে পারে।

পরবর্ত্তী অনেক লেখকের বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "রাজলক্ষ্মী," "চন্দ্রমুখী" প্রভৃতি চরিত্রে এইরূপ সহানুভূতির অনেক নিদর্শন আছে।

সেই সময়কার বাঙ্গলা ভাষায় কোনও সাপ্তাহিকের সম্পাদক এই "বারবিলাসিনী" কবিতার খুব বিরুদ্ধ ও অনুদার সমালোচনা করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ পাঠক কি আধুনিক কালের, কি তদানীন্তন সমাজের—নিশ্চয়ই এই অধীনের সহিত একমত হইবেন যে, এই দীর্ঘ কবিতাটী পাঠ করিলে দুরন্ত লালসার তো উদ্রেক হয়ই না—বরং বারবিলাসীর মর্ম্মন্তুদ বিলাপ, সর্ব্বনাশ ও অনুশোচনায় নির্ম্মম হৃদয়ও যে করুণায় বিগলিত হইয়া উঠে না, নয়ন পল্লব অশ্রুসিক্ত হয় না, এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। অথচ বিশেষভাবে এই কবিতাটির জন্যই ব্রাহ্মগণ চিত্তরঞ্জনের বিবাহের সময়ে তো যোগদান করেনই নাই, এমন কি

পণ্ডিতপ্রবর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই বিবাহে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজের চক্ষে তিনিও বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।"

[১৮৯৭ সালের Messenger]

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি ব্রাহ্মরা এত বিরূপ হন যে তাঁহাকে প্রচারকের আসন হইতে পর্য্যন্ত অপসারিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সময় যে বাদানুবাদ হয় তাহাতে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নগেন্দ্র বাবুর পক্ষে প্রতিবাদ করেন। ১৮৯৭ সালের ২২ ডিসেম্বরে তাঁহার লিখিত চিঠি Messenger-এ বাহির হয়।

মালঞ্চের কবিতাগুলির ভাষায় যেমন লালিত্য, উহার ছন্দও তেমনি মনোরম।

প্রথম কবিতাই "তোমার প্রেম" ইহার তুলনা কথনও করা হয় শাণিত কৃপাণের সঙ্গে—

তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ!
দিবানিশি করিতেছে হৃদি-রক্ত পান।

---

* গিরিশচন্দ্রের "বারাঙ্গনা" কবিতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে

"ছিল অন্য নারী সম হৃদয় কোমল
ছিল অকপট হাস,
ছিল প্রেম অভিলাষ
সে কথা স্মরিলে হায় চ'খে আসে জল

ফুরালো প্রেমের কথা জ্বলিল অনল
পণে তনু বিতরণ
অন্ন বস্ত্র আকিঞ্চন
পুড়েছে সকলি আছে রমণীর ছল।"

কখনও করেন 'ভুজঙ্গের মত', কখনও করেন স্বপন সমান—কখনও অনলের প্রায় কখনও প্রবাসীর প্রায়, কখনও মরণ সমান, কিন্তু কোথাও তুলনা মিলিল না, তাই অবশেষে কবি লিখিলেন :—

"তোমার ও প্রেম সখি ! তোমারি মতন
অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্য্যে মগন
    অধর, প্রশান্ত ধীর
    আঁখি, কৃষ্ণ, সুগভীর
পুষ্পিত হৃদয়তীর, সৌরভ-স্বপন।
এই কাছে এসে চাও
    ঐ দূরে চলে যাও
এ সকল ক্ষণিকের অর্দ্ধ-আলিঙ্গন।
    সমস্ত হৃদয় তব
    অজানিত নিত্য নব
বিশাল ধরণী আর অনন্ত গগন
তোমার ও প্রেম সেই তোমারি মতন।"

'জাগরণ' শীর্ষক কবিতায় কবি বলিতেছেন :—

"আমার এ প্রেম তুমি রেখোনা বাঁধিয়া
হৃদয় মন্দিরে গন্ধ বদ্ধ কুসুমের
সমস্ত-গগন-ভরা পবনে লাগিয়া,
সমস্ত ধরণী পা'ক্ প্রেম মরমের !"

কারণ এ প্রেমে কবি বিশ্বের আহ্বান শুনিতেছেন :—

প্রভাতে জাগ্রত হৃদি, শেষ কর গান
আমার জীবন ভরা বিশ্বের আহ্বান।

এবং তাহারই সাড়া তিনি দেন :—

প্রেম-ভিখারী, 'প্রভাত শিশির সম সৌন্দর্য্য ভরা' পাগলিনী 'ওফিলিয়ার' প্রাণের বেদনা কবিকে বিচলিত করিয়াছে—

দেবতার বজ্র যেন আসিল নামিয়া
তোমার মস্তক পরে সুন্দর তরুণ !
সুবর্ণ শৈশব-স্বপ্ন সকলি ঢাকিয়া,
চির অস্তাচলে গেল জীবন অরুণ !
এস এস পুষ্প হাতে, পূর্ণ-পাগলিনী !
সুধায়ো না—চক্ষে লেখা জীবন কাহিনী !"

'প্রাণের গান' কবিতাটীতে তিনি এখনও প্রাণের সঙ্গীত খুঁজিয়া পাইতেছেন না—

দুরাশা কম্পিত সুরে কি গান গাহিব আর
এত গীতি মনে মনে এত ভুল বার বার।
কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই,
অভিশপ্ত হৃদি মোর—গাহিতে পারিনা তাই।

'ঘুম-ঘোর' একটী সুমধুর ছোট কবিতা :—

আমি ত সঁপিনি হৃদি মরণেরে দেব বলে
আপনি পড়েছে ঢুলে পরাণ খুঁজিনু হায় !
নিশীথের ঘুম ঘোরে ভুবন ভ্রমিয়া দেখি
তোমারি চরণ মূলে ! সে প্রাণ তোমারি পায়।

'অহঙ্কার' শীর্ষক কবিতায় 'কবি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—হে ধার্ম্মিক, হে উচ্চ, তোমার কি পৃথিবীর ক্রন্দনে কাণ নাই, শুধু ঊর্দ্ধ মুখে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া আছ ! তাঁহার কল্পিত পূজাই কি জীবনে সর্ব্বস্ব, এই পৃথিবী, এই মানব এরা কি কিছু কেহ নয় :—

"ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়োনা ফিরিয়া
ধরণীর দুঃখ-দৈন্য যাহা আছে থাক্ !

ঊর্দ্ধ মুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্।
কোন্ সুখে কার তরে কর অহঙ্কার ?
মুছে ফেল আঁখি হতে মোহ-অন্ধকার।

'আকাঙ্ক্ষায়' কবি বলিতেছেন যদিও তোমার কথা আমার প্রাণে বসন্ত রাগিণী সম বাজিয়া উঠিয়াছে—

যদিও তোমারি প্রেম-রবির চুম্বনে
হৃদয়ের রক্ত ফুল উঠেছে ফুটিয়া
"আমার আকাঙ্ক্ষা তবু অসীম অধীর
তোমার স্বপন ছাড়ি তোমারে চাহিছে ;
মধু দেহে সুখস্পর্শ রহস্য গভীর
অপূর্ব্ব অধরে তব চুম্বন মাগিছে!
কোথা তুমি ? কাছে এসো করহ সৃজন
ধরণীর ম্লান বক্ষে নন্দন কানন!"

'প্রেম-চতুষ্টয়' আর একটি সুন্দর কবিতা:—

"আমার হৃদয়-দেহ গীত ভরা বীণা
তোমার চুম্বন তাহে চম্পক অঙ্গুলি
আছি মোহ অন্ধকারে তোমাতেই লীনা
চকিতে চমকি উঠে সঙ্গীত বিজুলি!
মধুর মৃদুল ভাবে কও কথা কও,
চেয়োনা কাতর কণ্ঠে লও সব লও।"

'চিরদিন' নামক কবিতায় কবি বলিয়াছেন :—

"রেখে গেছ জন্ম শোধ বিদায়ের বেলা
প্রেমভরা অশ্রুভরা বিষাদ-চুম্বন"

আর তার সাথে রাখিয়া গিয়াছে সজল নয়নের চিরস্মৃতি, প্রকৃতির বুকে তোমারি সে স্মৃতির ছায়া :—

"সমস্ত জীবন তব সন্ধ্যায় প্রভাতে
ভরেছি নিশ্বাসে মোর করিয়া যতন,
ছুটি দুঃখ ফুটিয়াছে জীবনের ফুল—
মিলনের মধু স্মৃতি স্বপনের ভুল।"

"সে" কবিতায়—কবি বলিতেছেন, সে এসেছিল, কেঁদেছিল, বসেছিল কাছে—

ভয় ভয় কথা কয়
ব্যথা পাই পাছে।
"দুটী হাত ধরে মোর
কি যে ভেবেছিল
বিদায় বলিয়া শুধু
কেঁদে থেমে গেল।"

"চলে গেছে সে," তার পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছি, আর কি সে আসিবে? আর কি হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে?

পথ পানে চেয়ে আছি
আসিবে কি শেষে?
উজলিবে হৃদি মোর
মৃদু মধু হেসে?

'স্মৃতি' কবিতায়ও এই ভাবই ফুটিয়াছে—

আজ সে গিয়াছে চ'লে, স্বপ্ন ছায়ে তার
বিশ্ব অঙ্গে ফুটিতেছে নব নব শোভা

'সাগর-তীরে' দাঁড়াইয়া প্রাণে জাগিতেছে—প্রিয়ার অতীতের স্মৃতি, কোথা আজ সে—

"আজ তুমি এত দূরে ? ভাবিতেছি কত
অপার অনন্ত সিন্ধু মাঝে দুজনার
ওপারে দাঁড়িয়ে তুমি দুরাশার মত
এ পারে তোমারি তরে জীবন আঁধার।

'লালসা'য় কবি বলিতেছেন :—

"ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যেন ক্ষিপ্ত সিন্ধু প্রায়
এ তপ্ত রক্তের জ্বালা যেতেছে বহিয়া।"

সাবধান, সখি ভুল ক'রোনা :—

"সুন্দর মরমভরা শুভ্র তনু সখি',
নয়নে লাবণ্য ভাসে প্রশান্ত বিবশা!
এখনও সময় আছে
ফিরে যাও সখি!
আমার এ প্রেম শুধু
রক্তের লালসা।"

'কবিভ্রাতা দেবেন্দ্র সেনের প্রতি' একটি সুললিত সুমধুর সনেট—

"তোমার কবিতা আমি বড় ভালবাসি
সুখ ভরা শান্তি ভরা স্বপ্ন ভরা সবি,
ব্যঙ্গ ভরা বাক্য আর রঙ্গ ভরা হাসি।"

মালঞ্চের "অভিশাপ" কবিতায় কবি যেন ভবিষ্যৎ জীবনের আভাষ পাইতেছেন—

স্বর্গে দেবেন্দ্রের নিকট ধরণীর সুখ দুঃখের কথা পৌছেনা। তিনি কেবল উপভোগে রত।

কিন্নরীর নৃত্যতানে অপ্সরার গীতজাগে।
নিতান্ত জড়িত!

এমন সময় হঠাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল।

যখন সে উপভোগে নিরত, ঝড় আসিল—

হেনকালে হুহু ক'রে আসিল ঝটিকা, আর্ত্ত
ক্রন্দনের মত
বহিয়া জগৎ হ'তে প্রাণপূর্ণ হতাশ্বাস
দুঃখ শত শত।

নৃত্যগীত থামিয়া গেল, "সুরেন্দ্রের স্বপ্নজাল" নিমেষে টুটিয়া গেল, প্রদীপমালা নির্ব্বাপিত হইল,

চিরোজ্জ্বল সুরসভা
স্তম্ভিত মলিন।

স্বর্গ কম্পিত হইল, আর—

তারি মাঝে ধরণীর অনন্ত আনন্দ স্রোত
আসিল ছুটিয়া
নন্দনের কুলে কুলে নতশির দেবতার
চরণ ঘিরিয়া।

বিষণ্ণ নন্দন পতি—বিষাদ কম্পিত কণ্ঠে আদেশ করিলেন—

আজি হ'তে মোর রাজ্য বন্ধরবে গীত-গান
শত উচ্চ হাসি—

কেননা—

আনন্দে অধির হয়ে শুনি নাই এতদিন
ক্রন্দন ধরার—
বাজেনি হৃদয়ে কভু মর্ম্মাহত ধরণীর
চিরমর্ম্মভার।

আজ ধরাবাসীর তীব্র আর্ত্তনাদ বজ্রশেল সম তাহার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে। তিনি সব ছাড়িয়া সঙ্কল্প করিলেন—

আজি হ'তে আমি হ'ব
ধরণীর প্রাণ
বাজিবে আমার মর্ম্মে জগতের দীর্ঘশ্বাস
শত দুঃখতান।
চির অশ্রুজল চ'খে জাগিয়া রহিব ল'য়ে
পূর্ণ পরিতাপ
বক্ষেতে বিঁধিয়া রবে শাণিত কৃপাণ সম
এই অভিশাপ—।

এই কবিতাটিতে চিত্তরঞ্জনের প্রাণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় এবং মনে হয় তিনি যাহা লিখিতেন প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে তাহা আসিত।

'মালঞ্চে'র শেষে কবি লিখিয়াছেন—

"ওগো আর নাই এই শেষ—
মালঞ্চের পুষ্প-রাজি
সকল দেখেছ আজি—
রজনী আসিছে নেমে এলাইয়া কেশ—
এই শেষ।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রণীত 'মালঞ্চে'র কবিতা সম্বন্ধে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (অধুনা "জাতীয় পাঠাগার") অধিনায়ক কবি জন এলেক্‌জেণ্ডার চ্যাপমান তাঁহার "Religious Lyrics of Bengal" পুস্তকে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কয়েকটি কবিতা তিনি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদও করিয়াছেন।

মালঞ্চের "দুঃখ" সম্বন্ধে কবি চ্যাপমান বলেন, 'Misery' is a strange poem to me. ইহার কয়েকটি ছত্রের নমুনা দিতেছি—

"তোমারে চিনেছি দুঃখ, তুমি রাখ মোরে,
আবরিয়া কি অপূর্ব্ব প্রেয়সীর মত
সংসারের সর্ব্বসুখ হ'তে, সাধ ক'রে
প্রাণ হ'তে ছিঁড়ে লও প্রাণ-পুষ্প শত!
অধর চুম্বন ছলে রক্ত কর পান
নিঃশ্বাসে মরণ আন অন্তরে আমার
আলিঙ্গন পাশে বাঁধ মৃত্যুর সমান
বিমুক্ত কুন্তলে কর অনন্ত আঁধার।"

"I know thee, misery. A wondrous fairy you keep me
From life's sweets ever. You pluck away
From the living the myriad life-flowers.
In guise of kissing
Blood to drink! So make death with me play
At every breath. Hold me in death's embracing."

'মালঞ্চের পরে 'মালা'র কবিতারাজি রচিত হয়। তারপরে রচিত হয় 'সাগর সঙ্গীত'। তবে 'মালা' প্রকাশিত হয় 'সাগরসঙ্গীতে'র পরে 'অশোকগুচ্ছের' কবি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে।

যে সামান্য অবিশ্বাসের অন্ধকার মালঞ্চে প্রতিভাত ছিল, 'মালা'র তাহা বিদূরিত হইয়া মালা ঈশ্বরের দিকে কবির মন সম্পূর্ণভাবে উন্মুখ করিয়াছে। কবি "প্রেম ও প্রদীপের" আলো দেখিয়া ভগবানের সন্ধান করিতেছেন—

আমি যে তোমারে চাই, সন্ধ্যার মাঝারে
তোমার ও প্রদীপের আলো অন্ধকারে
সকল সুখের মাঝে সর্ব্ব বেদনায়
কর্ম্মক্লান্ত-দিবাশেষে চিত্ত ছুটে যায়
"ওই তব প্রদীপের আলো অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া, তাই খুঁজিবারে
আজি জীবনের শেষ—আজো তুমি জয়ী,
তোমারে খুঁজেছি আমি আলোকে আঁধারে
সারাটি জীবন ধরি ; মরণ মাঝারে
সকল সুখের মাঝে সর্ব্ব সাধনায়!
আজি শ্রান্ত জীবনের ধূসর সন্ধ্যায়
হে মোর লুকান ধন! আজো তুমি জয়ী
আজো খুঁজিতেছি তোরে হে রহস্যময়ী!"

অন্ধকারে খুঁজিয়া কবি কেবল নিরাশই হন নাই, তাঁহার মনে আশারও সঞ্চার হইয়াছে। কারণ—

"হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি কোথা অন্ধকার?"

কবি তখন স্পষ্ট দেখিতেছেন—

"সকল গগন ঘেরা সাঁঝের স্বপন ছায়া
সকল ধরণী 'পরে বিছায়েছে ম্লান মায়া।
এরি মাঝে সত্যরূপে উজলি উঠেছে ওই
তোমার প্রদীপখানি!
কি সত্য সুন্দররূপে আঁধারে জ্বলিছে ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপখানি!"

কবিও আনন্দভরে বলিতেছেন—

"তখন কি বেজেছিল হৃদয় আকাশে
এমনি উদাস করা বিধাতার বাণী?
উজলি উঠিল যবে সেই যে প্রথম
আলো অন্ধকার ভরা প্রদীপে তোমার
সকল ধেয়ান তব সকল ধরম
সকল আলোক ওগো! সকল আঁধার।"

সহজ স্বাভাবিক কথায় সন্ধ্যার অতি সুন্দর ছবি চিত্রিত হইয়াছে—"আপনার মাঝে" কবিতায়। কবি পাখীকে ডাকিয়া বলিতেছেন—

"ওরে পাখী সন্ধ্যা হ'ল আয়রে কুলায়
সমস্ত গগন ভরি
আঁধার পড়িছে ঝরি
ওরে পাখী অন্ধকারে নীড়ে ফিরে আয়।
বন্ধ কর পক্ষ তোর আয়রে কুলায়।"

ইহা একেবারে অতীন্দ্রিয়ের আহ্বান, ইহা একেবারে কবির প্রাণের কথা।

'মালার' কবিতাগুলি সমধিক আনন্দ দিত স্বর্গীয় স্বর্ণকুমারী দেবী

এবং উক্ত চ্যাপম্যান সাহেবকে। স্বর্ণকুমারী দেবী 'মালার' কবিতাগুলির সমালোচনা করিয়াছিলেন 'মাসিক বসুমতী'তে, আর চ্যাপমান সাহেবও অনেক কবিতার ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। যেমন 'প্রার্থনা' কবিতাটি—

"নিখিলের প্রাণ তুমি! তুমি হে আমার
দিবসের দিনমণি নিশার আঁধার,
জাগরণে কর্ম্মভূমি
শয়নের স্বপ্ন তুমি
ওগো সর্ব্বপ্রাণময়! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি নিশার আঁধার।

Thou art the life of the universe, to me
The light of day art, and the dark of night
Activity's field when I do wake and see,
In sleep my dream. Oh, Life of Life, the light
Thou art to me of day, the dark of night.

ভগবানে প্রেম আরও দৃঢ় দেখিতে পাই "তুমি" কবিতায়:

খুলিয়া হৃদয় দ্বার আমি বিছাইব
যতনা সৌন্দর্য্য আছে যতনা স্বপন
সর্ব্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি ক'র, ওগো ক'র আমারি জীবন
তোমার চরণভূমি।

মালঞ্চের অন্ধকারভাব "প্রেম ও প্রদীপে" বিদূরিত হওয়ায়, তিনি এখন নির্ভয়, এখন মনকে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম বলিয়াই কবি গাহিতেছেন—

"ভয় নাই ওরে মন! কররে নির্ভর
অন্ধকারাক্রান্ত এই আপনারি 'পর।

এই যে আঁধার রাত্রি
নয়ন ভরিছে আজি
এরি মাঝে পাবি তুই আত্মপরিচয়
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি শুধু আর কিছু নয়!"

আর এই আলোই তাঁহাকে শান্ত করিয়াছে—

"পরাণ মন্দিরে আজি মহা নীরবতা।"

কবি চ্যাপম্যান বলেন—

The sense of long of incomplete self-realisation is expressed in the next poem—

My life is empty as a dream—
There is not stay for me, no stay.
Then darling wake, come in the substance
This and of springfull, my life make.

আজ আর ছোট ছোট গানগুলি কবির কাছে ভাল লাগে না—

"আজিকে ডুবুক যত ছোট ছোট গান
ওই তব মহাগানে ওগো মোর প্রাণ"

তিনি মহাসঙ্গীতের দূরাগত অস্ফুটধ্বনি শুনিতেছেন—

পূর্ণ ক'রে দাও আজি-শান্ত-এ হৃদয়
হে অনন্ত! হে সম্পূর্ণ! নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে ভরিয়া দাও অন্তর নিলয়,
ওই তব শব্দহীন মহান সঙ্গীতে। ("নীরবতা")

যে মহান ত্যাগ চিত্তরঞ্জনকে জগতের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে, তাহারও আভাস পাই এই "মালা"য়—

"সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,

আরো যে চাহিছ তুমি কি দিব গো আমি,
চাও যদি লয়ে যাও শূন্য প্রাণখানি।"

সকল ঐশ্বর্য্যসহ সর্ব্বস্ব সমেত তাঁহার "শূন্যপ্রাণই" জগতের ইতিহাসে "মৃত্যুহীন প্রাণ", তাই বিশ্বকবি বাঙ্গালীর মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া সত্যই গাহিয়াছিলেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

পূর্ব্বোক্ত কবিতা হইতে 'সাগর সঙ্গীতে'র ভাব আরও গভীর, ইহার দার্শনিক-তত্ত্ব এই সমস্ত সঙ্গীতের অন্তরালে নিবদ্ধ।—

তোমার এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। বাজাও আমারে,
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে।'

"সাগরসঙ্গীত"-এর একটু ইতিহাস আছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে মুক্ত করেন। মোকদ্দমায় "তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র" প্রভৃতি অনেক দার্শনিক কথার ব্যাখ্যা করিতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ বরাবর বলিতেন, "নারায়ণ" চিত্তরঞ্জনের উপর তাঁহাকে বাঁচাইবার ভার দিয়াছেন। দেশবন্ধু বলিতেন, "সওয়াল জবাবের সময় 'চেনে'র লকেটে অঙ্কিত নারায়ণ মূর্ত্তিকে আমি যেন দেখিয়াছিলাম ধূর্জ্জটিরূপে।" ইহার পরে তিনি ডুমরাওন মোকদ্দমায় মহারাজা কেশোপ্রসাদ সিংহকে রাজ-গদিতে বসান। কিন্তু এইখানে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বসন্তরঞ্জনের অকাল মৃত্যুতে শোকবিহ্বল হন। ইহার পরেই তিনি বিলাত যান। ফিরিবার পথে ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে সমুদ্রবক্ষে জাহাজের এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া উহা রচনা করেন। সেই

নিভৃতে বসিয়া বিশাল নিলাম্বুর তরঙ্গ-ভঙ্গি দেখিতেন, আর দেখিতেন ঐ দূরে—দিক্ নাই, অন্ত নাই,—কুল নাই, কোন্ দিগন্ত প্রদেশে ঐ উর্দ্ধের নীলাকাশ এই বিস্তীর্ণ জলরাশির সহিত মিশিয়াছে, আরও উর্দ্ধে চাহিতেন—ভাবিতেন এই অদ্ভুত সৃষ্টি যাঁহার রচনা, কি অনন্ত তাঁহার রূপ, কত সুন্দর সেই বিশ্বস্রষ্টা, কত অসীম তাঁহার করুণা! সাগরের তরঙ্গ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত, আর সেই অর্ণবের গানে অন্তর বিজনে অসীমকে বাঁধিতে চাহিতেন! অসীমের উদ্দেশে রচিত সেই গানই "সাগর সঙ্গীত।" অপরিমিত ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দই এই অপূর্ব্ব কাব্যখানি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

কবি গাহিতেছেন—

"হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ী
দাঁড়াও ক্ষণেক তোমা ছন্দে গেঁথে লই।
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্র করে
করিতেছে টলমল কি যে স্বপ্ন ভরে!
সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ি!
দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি ছন্দে গেঁথে লই
দাঁড়াও ক্ষণেক! আমি অর্ণবের গানে
পরিপূর্ণ শব্দহীন অন্তরের তানে
ছন্দাতীত ছন্দে আমি তোমারে বাঁধিব
তুমি কি রবে না সেথা! হে স্বপ্ন-অঞ্চলা।
ছন্দবদ্ধ, পরিপূর্ণ নিত্য অ-চঞ্চলা।

এখানে অসীম সাগর তাঁহার আরাধ্য অসীমেরই পার্থিব প্রতীক—বারিব্রহ্ম!

"সাগরসঙ্গীতে" কেবল অদ্বৈতদর্শনই নাই, অসীমের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা ইহার ছত্রে ছত্রে। সময় সময় মায়াবাদ শূন্যবাদের মধ্যে দিশাহারা হইলেও—

"গগন আলোকহীন, শশীতারা কিছু নাই,
যেন কোন মহাশূন্য ঘিরেছে সকল ঠাঁই।"

তখনই আবার "মহাকাল থেমে গেছে, তোমার চরণতলে" আর নির্ভরতার অবস্থা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—

"ওগো যন্ত্রি! আমি যন্ত্র বাজাও আমারে,—
তোমার অপূর্ব্ব এই আলো অন্ধকারে!
আমার জীবন ল'য়ে কি খেলা খেলিলে
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে!
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন!"

"সাগর-সঙ্গীত" বৈদান্তিকের মায়াবাদ ও বৈষ্ণবীয় প্রেমের আত্মসমর্পণ, এতদুভয়ের সংযোগস্থল। কখনও দেখিতেছেন—"অন্তহীন দিশাহারা"..."শিশুশশী নাই", আবার কখনও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে প্রেমিক-প্রেমিকার দ্বৈতভাব—গুপ্ত অভিসার—পুরাতন প্রেম—

"দুইজনে মিলিব হে! গাব দু'জনায়
চারিদিকে অন্ধকার রহিবে প্রহরী,
একসূত্রে বাঁধা রব আমরা দু'জনে
তরুণ উষার কোলে স্বপনে বিজনে।"

বৈষ্ণবীয় প্রেমে বিভোর কবি কান্তভাবাপন্ন হইয়া বলিতেছেন—

"তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে,

কতবার ছাড়াছাড়ি মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার !"

কেবল মিলনেই নয়,—সাধন ভজনে রত থাকিয়া মিলন,—তাই কবি বলিতেছেন—

"হে সাধক, হে ভকত, করহ কীর্ত্তন। নব !
সঙ্গে রেখো চিরকাল, সাধনে ভজনে তব !"

"সাগর-সঙ্গীতে" কবি সাগর-গর্জ্জনের ন্যায় পরম প্রেমাস্পদের আহ্বান শুনিতেছেন, কিন্তু বহিঃপ্রকৃতিতে তিনি আপনার প্রাণের ধন দেখিতে পান নাই, তিনি কেবল আভাস পাইয়াছেন—

"পেয়েছি আভাস আমি পাইনি সন্ধান তার,
যুক্ত করে বসিয়াছি কর মোরে একাকার—"

তাই তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া কাতরভাবে বলিতেছেন—

"কার পানে কোন্ মন্ত্র করি উচ্চারণ ?"

কিন্তু বহিঃপ্রকৃতিই যেন তাহার গুরুর কাজ করিয়া তাঁহার অন্তরের নিধি পাইবার জন্য সহায়তা করে,—তাই তিনি গাহিতেছেন—

"দীক্ষা দাও ওগো গুরু ! মন্ত্র দাও মোরে,
পূজার সঙ্গীতে তব প্রাণ দাও ভ'রে !

শ্রীঅরবিন্দ "সাগর সঙ্গীত" কাব্যখানি ইংরাজীতে এমন সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন, ইংরাজের পক্ষেও কবিতার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে কোন কষ্ট হইবে না। যেমন সাগরকে উল্লেখ করিয়া কবি একস্থানে বলিতেছেন—

এখনো জাগেনি কেহ, আমি জাগিয়াছি
নীরবে নিভৃতে হবে দেখা দুজনায়,

এখনো উঠেনি রবি আমি উঠিয়াছি—
সিনান করিব তব প্রাণ মহিমায়।
বাহিরের গীত রবে, বাহিরে পড়িয়া
সবাই শুনে যা সে ত সবাকার তরে।
দিও মোরে ল'য়ে যাব হৃদয় ভরিয়া
যে গীত অতলে তব দিবানিশি ঝরে।
হে সিন্ধু! হে বন্ধু! ওগো তাই আসিয়াছি
সে গীত বাজিবে বলে আমি জাগিয়াছি।

None is yet awake but I,
In this silent loveliness we two
shall meet
Tne sun has not risen, but I
go forth
To bathe in the glory of thy soul!
Thy outward song shall for ever
out ward remain,
The songs that all may hear
are for all ;
Give me the song which day
and night
In the depths of thy soul for
ever sings!
I will take it away and keep it with me
And with its music I shall fill
my soul!

Therefore O sea ! O friend !
I come alone,
And it is for the hope of the
Song that I am awake
হে সাধক, হে ভকত, করহ কীর্ত্তন নব !
সঙ্গে রেখো চিরকাল, সাধনে ভজনে তব !
O devotee, O heart full of
prayerfulness !
Sing thy Kirtan anew !
Keep me with thee for ever in
the prayers and devotion.
এপার ওপার করে পারে নাও আর
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার !
This shore and that shore,
I am tired, they pall,
Where thou art shoreless, take
me from it all.

ইহার পরে Exacting Mistress আইনের গোলক ধাঁধায় তিনি এমন জড়িত হইয়া পড়েন যে, আর কাব্য রচনায় অবকাশ হয় না। আবার কয়টি ঘটনা তাঁহার জীবনে বড় রেখাপাত করে। পিতৃঋণ তাহার গলদেশ লৌহশৃঙ্খলের মত এমন ভাবে জড়াইয়া রাখিয়াছিল যে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সেই ঋণ (সত্তর হাজার টাকা) শোধ করিয়া তবে সেই শৃঙ্খলমুক্ত হন। সেইবারও তিনি বিলাত যান। আসিবার সময় বোম্বাই জাহাজঘাটে মাতৃরূপ দর্শন করেন। সে মা তাঁহার নিজ জননী নিস্তারিণী দেবী। গৃহে আসিয়া মাকে আর দেখিতে

পান না—দুইদিন পূর্ব্বে স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। ইহার পরেই তাঁহার জীবনের ধারায় ঘোর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এবার আবার তিনি সাহিত্যরচনায় মনোনিবেশ করিলেন। মোকদ্দমা করিতেন, অর্থও আসিত, কিন্তু চিত্ত নিবিষ্ট থাকিত একমাত্র অন্তর্যামীর প্রতি। এই "অন্তর্যামী"ই ১৯১৪ সালে রচিত হয়। তিনি 'নারায়ণের' চরণেই উহা নিবেদন করেন—

"এই অশ্রু, এই ব্যথা, এই হাহাকার,
তুমি না লইবে যদি কারে দিব আর॥"

তিনি একান্ত নির্ভরভাবে অন্তর্যামীকে উপলব্ধি করিতেছেন—

"যখনি দেখিতে নারি অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ তারি চারি পাশে।
কোথা হ'তে জ্বলে দীপ সম্মুখে তাহার?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার;
যখনি হৃদয় যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হ'য়ে আসে সঙ্গীতের ধার,
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর?
মহান সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপূর।"

কিন্তু কবি আক্ষেপ করিতেছেন—তুমি তো অপার দয়াল—আমার প্রাণে যে অসংখ্য কাঁটা, আমি তোমার আসন কোথায় স্থাপন করিব?

"এস আমার প্রাণের বঁধু! এস করুণ আঁখি,
আমার প্রাণ যে কাঁটায় ভরা, তোমায় কোথা রাখি!"

পথের মাঝে এত কাঁটা?
আগে নাহি জানি

আমার যে—

বেড়া আগুনের মত
জ্বলছে প্রাণে অবিরত

কিন্তু—তুমি একটুখানি দাঁড়াও, প্রভু, আমি সব কাঁটাগুলি তুলিয়া ফেলি—

"কাঁটা তোলা প্রাণের মাঝে আজ তোমারে রাখি!"

এখন আমি নির্ম্মল, তুমি শান্ত ভাবে আমার হৃদয়ে অবস্থান করো—

"এস আমার মৃত্যুঞ্জয় এস অবিনাশি
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশী
ভয় ত্রাস ঘুচে গেছে চিরদিনের তরে!
নাইক আর আঁধার কোন, আমার আঁখির পরে।
প্রাণের মাঝে আঁকে বাঁকে বিভীষিকা যত—
পালিয়ে গেছে তারা সব চিরদিনের মত
থাক আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অনুক্ষণ
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন।"

স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়া 'অন্তর্য্যামী'র কয়েকটী ছত্র আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন—"ইহাই কি স্বরাজের পথ? ধন্য তুমি দেশবন্ধু!" ছত্রগুলি এই—

"সব তার ছিঁড়ে গেছে, একখানি তার
প্রাণ মাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার।
সব আশা ঘুচে গেছে! একটী আশায়
ভূলুণ্ঠিত প্রাণলতা আকাশে দোলায়,

সর্ব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ মাঝে কাঁদে বার বার
সব কর্ম্ম শেষে আজ মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশাহারা!
সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথখানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী।"

দেশবন্ধু যখন "অন্তর্যামী" লেখেন, স্বরাজের জন্য তিনি বদ্ধ-পরিকর হন নাই। পরে হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই জীবন, ধন, মান, বাড়ীঘর সব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও ছিল 'বাহ্য'। তিনি বরাবর সেই অন্তর্যামীর আহ্বানই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন। অন্তরে বাহিরে ছিলেন তিনি পরম বৈষ্ণব।

"অন্তর্যামী"তে তবু 'তুমি' 'আমি' ভেদাভেদ আছে, কিন্তু "কিশোর কিশোরী"তে একেবারেই একাত্ম মিলন—কত জনম জনম তুমি আমি পরস্পরে প্রেমাবদ্ধ! কত জনমের চেনা চেনা ভাব কিন্তু আজ কি আনন্দ, আমাদের কি মধুর—যুগে যুগে পাওয়া না পাওয়া—মিলন সার্থক হইল—

"তোমার আমার মাঝে
অপর কি কেহ আছে?
কে বলেরে ধন্য ধন্য,
এ কা'র পদরজঃ
পরাণ পঙ্কজ
শোভা করে? হে মিলিত! হে মধু-মিলন!
হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি! ধন্য এ জীবন!

এই একাত্মমিলন—মধুর রসই "কিশোর কিশোরী"তে প্রতিভাত। আমরা আরও দেখিতে পাই, যে সুরে চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ

বাঙলা প্লাবিত করিয়াছেন, যে সুরে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস বাঙ্গলার প্রাণস্পর্শ করিয়াছেন, চিত্তরঞ্জনের গানেও সেই সুরই ধ্বনিত হয়—

মেঘের মাঝে ঐযে ভাসে
নীল সাগরের নীলমণি,
আমার প্রাণের মাঝে কি যে করে,
আমি ঝাঁপ দিব এখনি।
এতদিনের সাধনের ধন
ঐ যে ডাকে ভয় কিরে মন,
ওরে তোরা বাঁধিস না কেউ
আমি ঝাঁপ দিব এখনি।
ঐ যে ভাসে ঐ যে হাসে
নীল সাগরের নীলমণি।

নিম্নলিখিত গানটি তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল,—

ওগো আমার উজ্জ্বল বরণ
কেন লুকাও মেঘের মাঝে?
ওই তুমি কাছেই আছ
ওই যে তব নূপুর বাজে।

এই গানটিও বড়ই মধুর—

মিটায়ো না এই পিয়াসা
এইতো আমার মিষ্টি লাগে।
ওগো বিরহী, চিরবিরহী
এই তৃষা যেন নিত্য জাগে।
মিলন আমি চাই না হে,
এই তিয়াসা যেন নিত্য থাকে।

চোখের জলে এত মধু
প্রাণবঁধু হে প্রাণবঁধু!
মুছায়োনা চোখের বারি
নাইবা এলে আঁখির আগে।
নাই বা যদি মিলন হলো!
এই বিরহ যেন নিত্য জাগে।

এইবার নারায়ণ পত্রিকা সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় দিব—

১৯১৪ সালের জুন মাসে চিত্তরঞ্জনের পিতাও স্বর্গগত হন। ইহার পরেই তিনি 'নারায়ণ' পত্রিকা বাহির করেন, বাঙ্গলার প্রাণধারার সন্ধান লইয়া সাহিত্য রচনা করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

'নারায়ণ' পত্রিকা যে বাঙ্গালী জাতির অশেষ হিতসাধন করিয়াছে, সে সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ভক্তি-প্রাণ অরবিন্দ চিত্তরঞ্জনকে নারায়ণ ভাবে দেখায় একটা ফল ফলিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন যে কাগজ বাহির করিয়াছেন, তাহার নাম করিয়াছেন 'নারায়ণ'।

"তাঁহার মনের মধ্যে যে মন তাহার তলদেশে বিশ্বাস ছিল যে "নারায়ণ" দেশরক্ষা করিবেন। হইয়াছেও তাই। একটা মহলে বাঙ্গলার বড় একটা আদর ছিল না; সেটা ব্যারিষ্টার ও বিলাত ফেরত মহল, 'নারায়ণ' সে মহলে বিশেষ প্রচার করিয়াছিল। এমন সকল লোক আমার কাছে নারায়ণের কথা কহিতেন, যাহারা কখনও যে বাঙ্গলা পড়েন, আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না!… যাহারা ছেলে ভূমিষ্ঠ হইলেই পাছে বাঙ্গলা কথা শিখিয়া বাঙ্গালী

হইয়া যায়, সেই জন্যই গোড়া থেকে ছেলেদিগকে সাহেব করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহারাও "নারায়ণ" পড়িতেন।

"নারায়ণ একটি বড় কাজ করিয়া গিয়াছে। অনেক দিন হইতে বাঙ্গলা পণ্ডিতি সাধুভাষার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। উহার বিরুদ্ধে অনেকেই যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। 'নারায়ণ' পারিয়া উঠিয়াছিল। নারায়ণের সময় হইতেই সাধুভাষা একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এখন "নির্ম্মিৎসা, চিকীর্ষা, জিগমিষা" নদ নদী পর্ব্বত কন্দর প্রভৃতি শব্দ আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; 'নারায়ণ' বাঙ্গলা ভাষাকে খাঁটি বাঙ্গলা ভাষা করিয়া দিয়া গিয়াছে। "নারায়ণে" ছোট ছোট গল্পগুলি খুব ভাল ছিল। দাশ মহাশয়ের নিজের পদ্যগুলি বেশ মিষ্ট লাগিত। তিনি যেন কি একটা প্রেমভক্তি ভালবাসার জিনিষ খুঁজিতেছেন, পাইতেছেন না, পাইবার জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছেন, উধাও হইয়া বেড়াইতেছেন, মনে হইত।

"নারায়ণে" সমালোচকের অভাব ছিল না, সমালোচনা কোনদিকে ঢলিয়া পড়িত না, বিশেষ করিয়া চারিদিক দেখিয়া লেখা হইত। অনেক লোকের উপাস্য দেবতাকে অসার বলিয়া উল্লেখ করিতে 'নারায়ণ' ভয় পাইত না। অনেক ঋষি তপস্বী ভণ্ড হইয়া গিয়াছে। অনেক অজানা লেখককে নারায়ণ জানাইয়া দিয়াছে।"

স্বর্গীয় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন:

"সাহিত্যানুরাগ ও অন্যান্য কারণে ভাব প্রেরিত হইয়া চিত্তরঞ্জন "নারায়ণ" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম প্রথম "নারায়ণ" পূজায় ত্রুটি হয় নাই।…"নারায়ণের" পূজা অব্যাহত থাকিলে আমাদের সাহিত্য সম্ভারের প্রকৃষ্ট প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করিত সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্য-ক্রমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত যথেষ্ট মনোবাদের কারণ হয়।"

ইহা মোটেই মনোবাদ নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি চিত্তরঞ্জনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তবে তৎকালীন রচনায় তিনি প্রতিবাদ করিতেন; এই সময় রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ হইতে নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়া শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিতেছিলেন। কলিকাতা হইতে স্যার জগদীশ বসু, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ প্রায় দুই শত লোক সেখানে গিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হইয়া আসিতে পারেন নাই। তাহার ৩।৪ মাস মধ্যেই ১৩২১ সালের বৈশাখ মাস ইংরাজী ১৯১৪ এপ্রিল হইতে "একটা নূতন কিছু করিবেন" বলিয়া স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বীরবলী ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়া "সবুজপত্র" মাসিক পত্র বাহির করেন। তিনি 'মুখবন্ধে' বলেন—

"ইউরোপের সংস্পর্শে আমরা আর কিছু না হোক, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়ভাব থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ, সেই আনন্দ হ'তেই আমাদের নব সাহিত্যের সৃষ্টি। এই নবজীবনের নব শিক্ষার প্রচার ক'রবার একটা সহজ উপায় আবিষ্কার করেছি বলেই আমরা এই নূতন পত্র প্রকাশ ক'রতে উদ্যত হয়েছি।"

১৩২১ সালের বৈশাখ মাসের কাগজে অর্থাৎ প্রথম সংখ্যায় একটি ছোট কবিতা বাদে সব লেখাই ছিল রবীন্দ্রনাথের। কি প্রবন্ধ, কি গল্প, কি কবিতা সবারই রচয়িতা ছিলেন একমাত্র তিনি। এক ১৩২১ সালেই হালদার গোষ্ঠী, হৈমবতী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র প্রভৃতি ৮।৯টি গল্প বাহির হয়, আর কোন কোন চিত্রে সম্পাদক-কথিত নব-সাহিত্য প্রচার সুগম হইয়াছিল। ইবসেনের A Dolls House নাটকটির নায়িকা নোরা "I have duties to myself, I must educate myself" বলিয়া স্বামীর সঙ্গে সামান্য মনোবাদ হওয়ায় কেবল একখানি

গরম কাপড়, টুপীটা এবং একটি ছোট ব্যাগ লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমী স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে এবং কেন আসিয়াছে তাহা সে ব্যক্ত করিয়াছে। আর "স্ত্রীর পত্রে" মেজবৌ মৃণাল স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আসিয়া পরুষভাবে স্বামীকে লিখিতেছে—"তোমার দাদার চরিত্র যেমন হৌক, তোমার চরিত্রে এমন কোন দোষ নাই, যাতে বিধাতাকে মন্দ বল্‌তে পারি। কিন্তু আমি তোমাদের বাড়ীতে আর ফিরব না…আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই, আজ আমি বেঁচে থাকতে লেগে রইলুম, কারণ লেগে থাকাই ত বেঁচে থাকা।"

রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"ও সবুজপত্রে বাহির হয়।

চিত্তরঞ্জন এই সাহিত্যের প্রতিবাদ করিলেন আর উহা মুখর হয় "নারায়ণে"—উহা সবুজপত্রের ৭ মাস পরে অগ্রহায়ণ ১৩২১ (১৯১৪, নভেম্বর) হইতে বাহির হয়। ইহাতে চিত্তরঞ্জনের গান, কীর্ত্তন, অন্তর্যামী, কিশোর কিশোরী এবং গল্প দুইটি 'ডালিম' ও 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' বাহির হয়। আর ইহার লেখক ছিলেন পণ্ডিতাগ্রগণ্য আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জলধর সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রভৃতি সাহিত্যরথীগণ। এই নবসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার "কবিতার কথায়" চিত্তরঞ্জন স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করেন—

"বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জলকে সত্য করিতে হইলে বাঙ্গালীর কবিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে।"

"হিন্দুর আন্তরিক ভাব—বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ—চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্য্যন্ত—সেই অক্ষুণ্ণ ধারা কোথায় লুকাইল? ইউরোপীয় সাহিত্যে মন ডুবাইয়া দিয়া আমরা কি শেষে

বাঙ্গলা কবিতার যে প্রাণ তাহাই হারাইয়া ফেলিব? আমি বুঝিতেছি, অনেকের এ কথা ভাল লাগিতেছে না। তাহারা হয় তো বলিবেন কবিতা কি চিরকাল একরকমই থাকিবে? আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পরিসর বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং কবিতাকে সেই পুরাতন গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া দিলে কেমনে চলিবে।" আমি তো কোন গণ্ডীর কথা বলি নাই, আমি কবিতার রাজ্যের কথা বলিয়াছি, কাব্যলোকের কথা বলিয়াছি। এই কাব্যলোকের কোন সীমা নাই। এ রাজ্য অসীম অনন্ত। জীবনের পরিসর যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া থাকে, কবিতার বিষয়ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইবসেন হইতে কাড়াকাড়ি করিয়া কবিতার বিষয় সংগ্রহ করা হইতে পারে। নানাফুলে মধুপায়ী ভ্রমরের মত মেটারলিঙ্কের পত্রে পত্রে মধু আহরণ করা চলিতে পারে, আমরা সে বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া কবির নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু কবি যদি সেই কাব্যলোকে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তাঁহার কবিতা বৃথা। একদিনে তাহা লোকের মন চমকাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা চিরদিনের জিনিষ নহে। বিষয় যাহাই হউক না কেন, কবির অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই, সেই মহামিলন মন্দিরের সাধক হওয়া চাই। সে অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ দর্শন আবশ্যক। সে মন্দিরে যে সঙ্গীতস্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অবগাহন করা চাই—ভাসা চাই—ডুবা চাই! নতুবা দূরে দাঁড়াইয়া, বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মনগড়া কল্পিত ভাবরাশি খুব ওস্তাদি রকমের ছন্দে প্রকাশ করিলেও কবিতা হয় না।

"বাঙ্গলা কবিতার সেই সরল সত্যপ্রাণ আমরা হারাইতে বসিয়াছি বলিয়াই আমাদের কবিতার ভাষা ও ধরণ ক্রমশঃ কিম্ভুত কিমাকার হইয়া আসিতেছে।

আজকালকার দিনে

"এই হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল"—

এই ভাবটি প্রকাশ করিতে হইলে নানারকম উপমার আবশ্যক হয়। ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছানিয়া বুনিয়া ফেনাইয়া ফেনাইয়া বলিতে হয়। তাহা না হইলে নাকি কবিতা হয় না। আজকাল আমরা সবাই খেলোয়াড়। কবিতা লিখিতে গিয়া খেলিতে বসি। একটী ভাব কোন রকমে জোগাড় হইলেই তাহাতে ভাষার রং মাখাইতে বসি এবং সেই রঙ্গিন জিনিষটাকে লইয়া, বল খেলার মত তাহাকে আছড়াইয়া আছড়াইয়া খেলিতে থাকি। কবির হৃদয় হইতে কোন ভাবই সহজে, সরলভাবে পাঠকের মনে আসে না। কবি যেন তাহাকে তাঁহার মন হইতে নামাইয়া মাঠে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে খেলা করেন, আর সেই অবসরে পাঠকেরা একটু একটু দেখিয়া লয়, আর কবির কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করে।

"কিন্তু ইহা ত বাঙ্গলার কবিতার ধরণ নয়। যে পরিমাণে প্রাণের অভাব হয়, সেই পরিমাণেই ধরণের মাত্রা বাড়িয়া যায়। বাঙ্গলা কবিতার ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে। তাই আজকাল বাঙ্গলা কবিতাতে আন্তরিকতার এত অভাব ও ধরণের এত বাড়াবাড়ি!"

ছন্দ এবং ভাষার কথায়ও তিনি রবীন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন :

"আজ কালকার কবিতা পড়িলে মনে হয় যেন আমাদের ভাব, ভাষা, ধরণ সব বদলাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভাষা অন্য প্রকারের। আমরা প্রত্যেক কথাই এত ঘুরাইয়া বলি যে সাধাসিধে লোক বুঝিতে পারে না। আমাদের ছন্দের এখন সাপের মতন

বক্রগতি। তা'র ঝঙ্কারে এত প্রকারের রাগ-রাগিণী আলাপ থাকে যে, যাহার যথেষ্ট সুরবোধ আছে সে ভাব বেচারাকে একেবারেই আমল দেয় না, আর যে হতভাগ্যের যথেষ্ট সুরবোধ নাই সে অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতে পারে না।

'আমি পণ্ডিত নহি, দার্শনিকও নহি, কিন্তু আশৈশব সাহিত্য সেবার চেষ্টা করিয়াছি! ইউরোপীয় বড় বড় লেখকেরা আজকাল কি লেখেন, আমি হয়ত ভাল করিয়া জানি না। হয়তো আমার বুঝিবার মত ক্ষমতাই নাই। কিন্তু বাঙ্গলা কবিতার যথার্থ প্রাণ কি, তাহা আমি বুঝি ও কতকটা জানি। তাহারই গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমার হাতের কলম কেহ কাড়িয়া লয় নাই সত্য, কিন্তু আমি তো সাধক নহি,—সাহিত্য-মন্দির প্রাঙ্গণে সামান্য কিঙ্কর মাত্র। সেই গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই। যাঁহাদের আছে তাঁহাদের দুর্ভাগ্য যে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী!"

("কাব্যের কথা," ১৯১৪ ডিসেম্বর)

চিত্তরঞ্জন তাঁহার অসংখ্য প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন, কেননা চণ্ডীদাস প্রেমের কবি। তিনি বলিতেন, "শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ Idealist নয়, Realist নয়, সে Naturalist। তাঁহার মতে যাহার ইন্দ্রিয়ভোগে অতীন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই ও যিনি কেবল নীতি কথাই প্রচার করিতে চাহেন, উভয়ের কেহই কল্প-কলা সৃষ্টির অধিকারী নহে। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান পায়, সেই কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং চণ্ডীদাস এই ভাবের শ্রেষ্ঠ কবি! তাঁহারই কবিতায় মহামিলন মন্দিরের গীতধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন—কৃষ্ণ প্রেমে

মজিয়া যখন রাধিকা কুলমানের কথা ভাবিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি।"

কবি তখন একেবারে রাধিকার মনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

কহে চণ্ডীদাস শুনে বিনোদিনী
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুখ যায় তার ঠাঞি?

চিত্তরঞ্জন বলেন—

"এরূপ কবিতা আজকাল শুনিতে পাই না, আর কি শুনিতে পাইব না?"

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম"—তে চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "এ তো সেই মহামিলন মন্দিরের গীতধ্বনি, আর জীবনের সকল গীতই এই মিলন মন্দিরে নিরন্তন ধ্বনিত হয়, তাই এত শতাব্দী পরেও গানটি পড়িলেই মনে হয়—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ"

এ সুর কোন্ ভাষায়, কোন্ সাহিত্যে পাওয়া যায়!

'নারায়ণ' ৫।৬ বৎসর সমভাবে চলিয়াছিল। তারপর তিনিও ফকিরি গ্রহণ করিয়া দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, নারায়ণও উঠিয়া যায়। উপরোক্ত মতদ্বৈধ থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার কখন ব্যত্যয় হয় নাই। ১৯২১ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

আর তাঁহার মহাপ্রয়াণের পরে যে দুইটি ছত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে বাহির হয়, তাহাও অমর সাহিত্যেই পরিণত হইয়াছে—

"এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান!"

উপসংহারে চিত্তরঞ্জনের শেষদিকে রচিত গানটি আপনাদিগকে উপহার দিতেছি—

"নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার
আমার সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার।
সেই যে শিরে মোহন চূড়া
সেই যে হাতে মোহন বাঁশী;
সেই মূরতি হেরব ব'লে
পরাণ বড় অভিলাষী।
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে
আলো করি কুঞ্জ দুয়ার;
এসো আমার পরশ মানিক,
বেদ বেদান্তে কাজ কি আর।"

চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই গান শুনিয়াছি, কিন্তু এখন তাহা থামিয়া গিয়াছে। আজ সেই মোহন বংশীধারী নীল সাগরের নীলমণিই আমাদের সকল গর্ব্ব ও অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া বাঁশী হস্তে আমাদের সকলের হৃদয় সুশোভিত করুন এবং আমরা যেন সমস্বরে গাহিতে পারি—

"মেঘের মাঝে ঐ যে সাজে নীল সাগরের নীলমণি
আমার প্রাণের মাঝে কি যে করে
আমি ঝাঁপ দিব এখনি।"

তৃতীয় অধ্যায়

সমালোচনায়

সাহিত্য-সাধনায়ও চিত্তরঞ্জন ছিলেন একান্ত দেশপ্রেমিক। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধমাত্রেই তাঁহার নির্জ্জলা দেশভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও মহাকবি গিরিশচন্দ্রের পরে এরূপ সর্ব্বদিক হইতে খাঁটী দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক কুত্রাপি দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ দেশকে যে ভালবাসে, জাতির প্রতি যাহার অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, মাতৃভূমির গরবে যে গরীয়ান, সে যে কোন ক্ষেত্রেই বিচরণ করুক না কেন, মাতৃপূজায় তাহার ঔদাসিন্য দৃষ্ট হয় না। আমরা আজ অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর-রক্ষক চিত্তরঞ্জনের কথা বলিব না, আমরা সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধুর কীর্ত্তি-কাহিনীও বিঘোষিত করিতে চাহি না, সাহিত্যের সহায়তায়ই তাঁহার দেশভক্তির অভিব্যক্তির সামান্য পরিচয় দিব।

১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন যে বাঁকীপুরে হয়, সেই প্রসঙ্গেই বলিতেছি। 'বাঙ্গলার গীতিকবিতা' নামক স্বরচিত পুস্তক পাঠ করিয়া প্রথমেই বাঙ্গলার কথায় তিনি উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন। ভাবাবিষ্ট চিত্তরঞ্জনের মুখে খাঁটি বাঙ্গলার জাতীয় ভাবটিই ভাসিয়া উঠিয়াছে—

"বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে, শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায়,

সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গলার প্রাণ, বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ, বাঙ্গলার ঢেউ খেলান শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধুগন্ধবহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপধুনা জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর প্রাঙ্গণ, বাঙ্গলার নদনদী, খালবিল, বাঙ্গলার মাঠ, বাঙ্গলার ঘাট, তালগাছঘেরা বাঙ্গলার পুষ্করিণী, পূজার ফুলেভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার তুলসীপত্র, বাঙ্গলার গঙ্গাজল, বাঙ্গলার নবদ্বীপ, বাঙ্গলার সেই সাগরতরঙ্গে চরণ বিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গলার সাগর সঙ্গম, ত্রিবেণী সঙ্গম, বাঙ্গলার কাশী, বাঙ্গলার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন, আচার-ব্যবহার, বাঙ্গলার ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ! এই সবই যে সেই প্রাণধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে!

"সেই প্রাণ-তরঙ্গে একদিন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল, এক অপূর্ব্ব অসংখ্য দল পদ্মের মত বাঙ্গলার গীতিকাব্য! কিন্তু ফুল ত একদিনে ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে অতীতের অনেক আয়োজন সাপেক্ষ। কত কাল, কত যুগ কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার বাঙ্গলা জাগিয়া দেখিল তাহার আশে পাশে এত রূপ, এত সুর, এত গান—মনপ্রাণ বিচিত্র রসে ভরিয়া উঠিল, আর তখনই বাঙ্গালীর কবি গাহিয়া উঠিল—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

"জীবন এক মহামিলন মন্দির। কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত না সুরের খেলা, কত না রসের মেলা; আ

তিলে তিলে নূতন হইয়া উঠিতেছি। বাঙ্গলার কবি তখন চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে গাহিলেন—

"নবরে নব নিতুই নব
যখনি হেরি তখনি নব!"

"আদিম যুগ হইতে বাঙ্গলার বুকে অনেক আশা, অনেক ভাব আপনা আপনি জমাট বাঁধিতেছিল, সে যে হৃদয়ের মাঝে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কাহার খোঁজ করিতেছিল, মিলন পরশের জন্ত আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মনের ভিতর ডুবিয়া ডুবিয়া যেই দেখিতে পাইল, আর সে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তখন কবি গাহিয়া উঠিলেন—

"হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে"

"হৃদয়ের মাঝে যে ভাব আপনা আপনি ফুটিতেছিল, সে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সে রূপ কেমন? যেন,

চরণ কমলে ভ্রমরা দোলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক

তাহাকে দেখিয়া কবি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, শুধু অন্তরের ভিতর মরমের সেই লুকান ঘরে বিভোর হইয়া দেখিতেছিলেন। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিতে পাইলেন তাঁহার মানস প্রতিমা, জীবন প্রতিমা—

"চম্পক বরণী, হরিণ নয়নী...
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ি, নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর"

"ইহাই বাঙ্গলা গীতি কবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে—জীবনের সঙ্গে

বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গলার প্রাণ সে মহা-মিলনে বিভোর হইয়া আছে। সেই মহামিলন মন্দিরে পূজা যে নিরন্ত চলিতেছে, বাঙ্গলার গান তাহার আরত্রিক—বাঙ্গলা ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গলার কবি চণ্ডিদাস, সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।”

এইরূপ হৃদয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়া চিত্তরঞ্জন বাঙ্গলার গীতি কবিতায় চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রামপ্রসাদ, কৃষ্ণদাসের কবিতার আলোচনা করিয়াছেন। এই সব মহাকবিগণের কবিতা ও গানের বিচিত্র ভাব সম্পদের কথা বলিয়া চিত্তরঞ্জন দুঃখ করিয়া বলেন—

“বাঙ্গলার প্রতীচের নব আগমনে, তাহার আলোকে তাহার বুকের সলিতা শুকাইয়া গেল, বাঙ্গলার দীপ নিভিয়া আসিল—বাঙ্গলা চিরদিন পূর্ব্ব দিকেই সূর্য্য উঠিতে দেখিয়াছে, অকস্মাৎ পশ্চিম আকাশে বিজলী জাকের মত আলোক দেখিয়া তাহার নয়নে ধাঁধাঁ লাগিল, বাঙ্গলা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতর যে প্রাণ ছিল, সে তখন তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিয়া দিল। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। এখন আর সে গান শুনিতে পাই না। একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধারা ও ভাবের আভাষকে কবিওয়ালাদের পদানুসরণ করিয়া কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, আর আসিয়াছিলেন নীলকণ্ঠ। কিন্তু রূপান্তরের সাধক এখনও আসেন নাই।

তবে বাঙ্গলা জাগিতেছে। দিনের নাগাল পাইবই পাইব। আবার সেই বাঙ্গলা কবিতা শুনিব। সে-সাধক আসিবেই আসিবে। আমি যে তাহার আগমনীর সুর শুনিতে পাই।”

“কবিতার কথায়”ও বাঙ্গলা কবিতার পুনরুদ্ধারের জন্য কাতরাহ্বান জানাইয়া তিনি উপসংহারে যে-কয়টি কথা বলেন, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। তিনি বলিতেছেন—

"আজ পরিণত বয়সে ও-পারের কথাই বেশী মনে হয়। আমি মরিয়া ছাই হইব। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কবিতামন্দিরে আমি যাহাকে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা হইবে। আমি দেখিবনা, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার প্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। আমি যেন চক্ষে সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় সেই মহামিলন মন্দিরের ধ্বনি আমার কানের ভিতর দিয়া প্রাণে প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

"আবার সেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। সাহিত্য সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আবার সেই মহামিলনের গীতধ্বনি শুনিতে পাইব—

না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে—

"যথার্থ কবি সেই মন্দিরে পৌঁছিয়া তাহারি গান বুকে বহন করিয়া আনিবেন, আমাদেরও অবস্থা হইবে—

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

তখন কেবলই মনে হইবে—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল;"

কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝিনু কৈছন কেলি
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেলি।”

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেই চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন, “চণ্ডিদাসকে আমি সর্ব্বপ্রধান কবি ব'লে মনে করি। চণ্ডিদাস বাঙ্গলার নিজস্ব কবি, বাঙ্গলার মাটির অন্তরের খাঁটি রস পাবেন চণ্ডিদাসে।

“বিদ্যাপতিকেও আমি চণ্ডিদাসের প্রায় কাছাকাছি মনে করি—তবে তাঁর আলঙ্কারিকতার জন্য নয়, যে মাধুর্য্য, যে রসতন্ময়তা চণ্ডিদাসে প্রচুর ছিল তাহা বিদ্যাপতিতেও কতকটা ছিল ব'লে। তবে চণ্ডিদাসের মৌলিকতা বিদ্যাপতিতে নাই। চণ্ডিদাস রামপ্রসাদেও অলঙ্কার পাওয়া যায়, তবে তাহা নীরস শুষ্ক সোণা জহরতের অলঙ্কার নয়—তাহা বনফুলের অলঙ্কার—ময়ূর পাখার অলঙ্কার—গঙ্গামৃত্তিকার তিলক, চন্দনকস্তুরীর অঙ্গরাগ।

চণ্ডিদাসের 'চলে নীল সাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি, পরাণ সহিত মোর' আর রামপ্রসাদের 'এ-সংসার ধোকার টাটি,” “মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত” প্রভৃতি গানের কি তুলনা আছে?”

“বাঙ্গলার গীতি কবিতা দ্বিতীয় কল্পে” কবি চিত্তরঞ্জন রামপ্রসাদের গানের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, “বাঙ্গলার এক অখণ্ড সত্য আছে। বাঙ্গলা একদিন তাহা নিজের মাটীর পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছিল এবং অন্ধকারেই দিন কাটাইতেছিল বটে, কিন্তু দীপের ধর্ম্মই জলিয়া উঠা, সেই দীপই একদিন বাঙ্গলার কবি চিন্তামণির বুকের ভিতর জলিয়াছিল, সেই দীপ একদিন মহাপ্রভুর বক্ষের মণি-কোটায় জলিয়াছিল, সেই দীপের আলোক মুসলমানযুগের আবহাওয়ার ভিতরেও রামপ্রসাদের প্রাণের ভিতর জলিয়াছিল, সেই দীপ এই কেবল

যুগেও গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীতলে জ্বলিয়াছিল। আজ এই দুর্দ্দিনে সূচীভেদ্য তমসাচ্ছন্ন আকাশতলে এই বৈষ্ণব সাহিত্যের মাঝে অকস্মাৎ বিজলী ঝলকের মত কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত মায়ের শ্রীরূপ দেখিলাম; আর দেখিলাম সেই মদনমোহন—

"বিধি সে রসিয়া তাহাতে পসিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা,"

চণ্ডিদাস এইরূপে পাশে রহিয়া ভাবে গদ্‌গদ হইয়া গাহিয়াছেন—

"চামর ঢুলায়ত"

চিত্তরঞ্জন বলেন, 'এ ছবি বাংলার নিজস্ব। আর এই প্রাণের ধারার সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের ধারার পরিচয়।' রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"গিরিবর! আর আমি পারিনা হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে,—
অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারি নাহে প্রবোধ দিতে উমারে।"

আয় আয় মা বলি, ধরিতে কর-অঙ্গুলি

প্রথম ছত্রটিতেই রাণী মেনকার স্নেহ, বাৎসল্য, মধুর রসের যে বেদনা, তাহার সুরেতে যে প্রতি অক্ষরেই মাখামাখি। চিত্তরঞ্জন বলেন, এই বাৎসল্য রসের চিত্র ও গানটিকে এই বৈষ্ণব যুগে যোরো কবিতা বলিয়া ব্যক্ত করা সহজ, কিন্তু যাঁহারা সত্য মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও বাৎসল্য রস জীবনে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া প্রাণের ভিতর অনুভূতিতে সে রস রস-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহারা জানেন, ইহার তুলনা কেহ দিতে পারে না। ইহা সত্যই বাঙ্গলার নিতান্ত ঘরের ছবি।

রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন ও গানে—যে গানের তুলনা হয় না, বাঙ্গলা আবার সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল।

রামমোহন সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলেন যে তিনি প্রতিভাশালী পুরুষ হইলেও বাঙ্গলার প্রাণের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। খৃষ্টান পাদরীদের বিরুদ্ধে হিন্দুর হইয়া তিনি যতই তর্ক করুন না কেন, এই ফেরঙ্গ আসিত না—কখনই আসিত না, বাঙ্গলার ভাষাকে ইংরাজী করিতে পারিত না, বাঙ্গলার ভাবকে কখনও ফেরঙ্গ করিতে পারিত না, যদি তিনি আমাদের দেশের সাধনাকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেন ও করিয়া ইংরাজী সভ্যতা সাধনা এমন করিয়া দুই হাতে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিতেন। রামমোহন আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গলার সাহিত্য, ধর্ম্ম ও গান রামপ্রসাদের সুর ও তাঁহার আদর্শে মাতিয়া উঠিয়াছিল। ঠিক যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন—রামপ্রসাদ যে সুরে গাহিয়া গেলেন, রামমোহন ঠিক তার উল্‌টা সুর ধরিলেন। রামমোহন গান করিলেন—

"অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর কর।"

আর রামপ্রসাদের গানের সুর এই একটি গানে বেশ বুঝা যাইবে—

"আর ভুলালে ভুলব না গো,
আমি অভয়-পদ সার করেছি, ভবে হেলব দুলব না গো।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উল্‌বো না গো,
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুল্‌ব না গো।
ধনলোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো,
আশা-রাহুগ্রস্ত হোয়ে মনের কথা খুল্‌ব না গো,

মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুলব না গো
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো।"

ইহার সঙ্গে চণ্ডিদাসের—

"সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঁই।"

তুলনা কতক হইতে পারে, ভাবের ধারা দু'জনের একই পথে পৌছিয়াছে, কিন্তু রামমোহনের গান, গান নহে, জোর করিয়া মানুষকে বেদান্তের ঔষধ গিলান। বাঙ্গলার শাক্ত রামপ্রসাদের প্রেম ভক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর ভক্তির ধারা বাঙ্গলার প্রাণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। বাঙ্গলার প্রাণধর্ম্মের সঙ্গে তাহাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল।"

"কিন্তু," চিত্তরঞ্জন বলেন, "এখন আমরা সত্য হারাইয়াছি, মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি, পুরুষত্ব হারাইয়া এই স্ত্রীজনসুলভ আধুনিক দুর্ব্বল প্রেমের সাহিত্যে মসগুল হইতেছি, জীবন লইয়া সাহিত্যের বাজারে যে খেলা চলিতেছে, এ খেলা নয়, নবযৌবনের দলের লীলা নয়, ইহা বিলাতী Coquetry, জীবনের সঙ্গে প্রাণের ছলা। কিন্তু বাঙ্গলার সন্তান! মুখ তোল, সত্যকে—জীবনকে মুখোমুখি দেখ, ভাল করিয়া পরিচয় করিয়া লও, দেখ ওই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে, বিশ্বাস ও প্রেম বুকের ভিতর, ভবিষ্যৎ আমাদেরই।"

"শাক্ত সাহিত্যধারায় রামপ্রসাদ" চিত্তরঞ্জন যাহা ১৯১৯ সালে লিখিয়াছেন, যাহা তিনি শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ও বর্ত্তমান লেখকের কাছে ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে পাটনায় পাঠ, আলোচনা ও সংশোধন করেন, সাহিত্যরথী গিরিজাশঙ্কর তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ ও পরে সংশোধিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতেও চিত্তরঞ্জন

দেখাইয়াছেন যে, প্রসাদী সংগীত একটা সার্থক জীবনের ক্রম অভিব্যক্তির ইতিহাস। সাধনার শেষ অবস্থায় রামপ্রসাদ সিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাই সাধনার রূপান্তর। সেই অবস্থায় আর কোন পূজা বা বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই রামপ্রসাদ গাহিতে পারিয়াছেন—

মন তোর ভাবনা কেনে ?
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে।
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কিরে তোর
সে বাজনে ?
তুমি 'জয়কালী' বলে দেও করতালি
মন রাখ সেই শ্রীচরণে।"

"রূপান্তরের কথায়"ও চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন—

"আমি কানে যে সুর শুনিতেছি, সে সুর আমার দেশবাসীকে শুনাইতে চাই। আমার দেশে যে সত্য আছে, তাহার সন্ধান লইতে হইবে, মাটী খুঁড়িয়া রত্ন উদ্ধার করিতে হইবে। ইংরাজী সাহিত্যে ও ফরাসী কবিতার তর্জ্জমা, হয় ত বা নরওয়ে সুইডেনের ছাঁচে গড়া, তাহাতে বাঙ্গালীর প্রাণ নাই, ধর্ম্ম নাই, আছে শুধু অনুকরণ। অনুকরণে কখনও জীবন আসে না, ধার করিয়া কখনও সম্পদ অর্জ্জন করা যায় নাই। এই সাহিত্যও সেই কারণে বস্তুহীন প্রাণহীন একটা অসার কাল্পনিক ভাবুকতায় ভরা। বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে তার কোন যোগ নাই।

"আমি বলিতে চাই যে, একমাত্র চণ্ডিদাসের গান ছাড়া বাঙ্গলা গীতি-কবিতার শেষ যুগে রামপ্রসাদের গানে সেই রূপান্তর হইয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রাণের যে সৌন্দর্য্য, তাহার কল্পনার যে সৃষ্টি, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর জীবনের মত এতবড় কাব্য আর কখনও রচিত হয় নাই। সার্থক রামপ্রসাদ

যে রসের আদর্শ আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহার জীবনে যে ফুটিয়াছে, একথা এখন নাই বলিলাম। চণ্ডিদাসের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল—তাহার সৃষ্টিই তাহার প্রমাণ। রাম প্রসাদের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল, তাঁহার সৃষ্টিও তাহারই প্রমাণ।"

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গীত, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও অভিভাষণ হইতে পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি খাঁটি জাতীয় সাহিত্যিক ও ধর্ম্মবিদের ভাব লইয়া চণ্ডিদাস, রামপ্রসাদ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের কাব্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি শাক্তও ছিলেন আবার বৈষ্ণবও ছিলেন। প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট শাক্ত বৈষ্ণবের কোন পার্থক্য নাই :

"চিন্তামণি কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনি
বরাভয় করা ভক্ত মনোহরা
শবোপরে নাচে বামা
কভু ধরে বাঁশী
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে।"

প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের নির্ভীক সমালোচনার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনার, ভক্তহৃদয়ের সমালোচনার কিছু পরিচয় দিলাম মাত্র, কিন্তু ইহা অতি সামান্য পরিচয়। ভবিষ্যতে কেহ যথার্থ আলোচনা করিয়া দেশবাসীকে প্রকৃত আনন্দরসে আপ্লুত করুন এই আশা লইয়া এখন বিদায় হইব।

চিত্তরঞ্জন আরও বলেন :

"এই বিশ্ব সৃষ্টির রসমাধুর্য্য উপভোগই জীবনের চরম। নিজে আত্মস্থ হইয়া এই বিশ্ব-আত্মার সহিত একান্ত যোগই মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। সেই পরম আত্মাই সারা বিশ্বের, এ বিশ্ব তাহার।

কবিতা যদি প্রেমের রাজ্যে না পৌঁছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির 'মণি কোঠার মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়'।

"এই নরদেহ ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া জগতের অন্ধ, বৃদ্ধ, শ্রান্ত, তৃষিত তাপিতের জন্য যে করুণা, মহাপ্রভুতে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে আমরা তাহার জীবন্ত সজীব জাগ্রত মূর্ত্তির ভাব পাই। যখন কলসীর কাণায় কপাল কাটিয়া দরদরধারে রক্ত ঝরিতেছে নিত্যানন্দ তখনও গাহিলেন—

"মেরেছ কলসীর কাণা
তা বলে কি প্রেম দেবনা!"

"এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন প্রাণ এক অদ্ভুত নব রসে উছলিয়া উঠে, আঁখি ছল ছল করে, মনে হয় আমার জন্ম সার্থক, আমি বাঙ্গলায় জন্মিয়াছি।"

এই অহিংস বুদ্ধি বরাবর চিত্তরঞ্জনকে অনুপ্রাণিত করে, এবং জাতীয় সংগ্রামেও উহা কেবল নীতি হিসাবে তিনি নেন নাই, ধর্ম্মহিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহা যে করিয়াছিলেন, তাহা মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দেরই কৃপায়। উপরোক্ত উক্তি সবই জাতীয়ভাব প্রসূত। সমালোচক চিত্তরঞ্জন খাঁটি স্বদেশী চিত্তরঞ্জনই বটেন।

যে সময়ে তিনি বাঁকীপুর সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন, ইহার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দেশবন্ধু বিক্রমপুর সম্মিলনীর সভায় সভাপতির অভিভাষণেও সাহিত্যের মধ্য দিয়া একটী পরম সত্য প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'ইহাই একজনের কাজ নহে, সকলের কাজ। ছোটবড় সকলকেই অগ্রসর হইতে হইবে। জীবন নারায়নের লীলা, ইহা অণু হইতে অনীয়ান্ মহৎ হইতে মহীয়ান্, ছোটবড় সবাই যে এ লীলার অন্তর্গত, ওই যে কৃষক উহাকে আহ্বান কর—ওই যে পতিত উহাকে বুকে টানিয়া লও,

নইলে তোমার অমঙ্গল হইবে। ওই যে স্বার্থপর উহাকে টানিয়া তুলিয়া ধর, তোমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে, ওই যে ধনী আপনার ধনভার বহন করিতেছে উহাকে ডাক, ওই যে দরিদ্র উহাকে কোল দাও; ওই যে শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যবসায়ী, অব্যবসায়ী, স্ত্রীপুরুষ, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সবাইকে ডাক, আর নারায়ণ যিনি জীবের অয়ন এবং যিনি নিজেই নর-নারায়ণ তাঁহাকে প্রণাম করি।"

সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি নারায়ণ, স্বদেশ মাতা এবং নর-নারায়ণ কখনও বিস্মৃত হইতেন না। তাঁহার সর্ব্বকার্য্যেই এই তিনের সমন্বয় হইত।

আবার আসিল একবৎসর পরে ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন। সেখানেও বন্দেমাতরম্, সুজলা সুফলা নদীবহুলা মাতৃভূমিকে বার বার নমস্কার করিয়া সাহিত্য-কোবিদগণকে যে অভিনন্দন প্রদান করেন, সেই দীর্ঘ প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিতে চাহিনা। শেষ কয়টি খাঁটি কথাই পাঠককে উপহার দিব :

"দরিদ্র সেবক মোরা আছি জন্ম জন্ম।—হে সাত্ত্বিক! আসুন তবে সমস্বরে মাকে ডাকি। মা যদি গঙ্গায় ডুবিয়া থাকেন, মা যদি মহাসাগরের স্থির গম্ভীর অতল জলেও ডুবিয়া থাকেন তিনি শুনিতে পাইবেন, মার ভাষা দিয়াই মাকে ডাকি আসুন! মা-ত আমাদের আর কোন বাণী শিখান নাই। মা আছেন, আবার মা উঠিবেন, আবার আমরা এই ভাগ্যবতী পদ্মানদী তীরে মাতৃপূজা করিব, আবার সেই সহস্রদলবাসিনী রাজরাজেশ্বরীর রক্তচরণে প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবি দান করিব, আর গললগ্নী কৃতবাসে বলিব—"জননী জাগৃহি।"

ইহা কেবল বক্তৃতা বা বাক্যচ্ছটা নহে—চিত্তরঞ্জনের নিকট জননী, জন্মভূমি, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী মা, জগজ্জননী মা সবই ছিল এক এবং প্রাণের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম হবি দান করিয়াই তিনি মাতৃপূজা করিয়া গিয়াছেন।

সমালোচনা ব্যতীত জাতীয়তা মূলক প্রবন্ধেও সাহিত্যরস কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে এইখানে তাহার পরিচয় দিতেছি। [১৯১৭ সালের প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণের কথা বলিতেছি—]
তিনি বলেন,—"আমার বাঙ্গলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য সকল অযোগ্যতা অক্ষমতা সত্বেও আমার বাঙ্গলার যে মূর্ত্তি তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছে এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস মন্দিরে সেই মোহিনীমূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটী অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি, বাঙ্গালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে, বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে সে আমার বাঙ্গলাকে জানে না"—

"বাঙ্গলার কথা কি আমরা ভাবি? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগ নাই; তাই আমাদের আন্দোলন অসার বস্তুহীন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, মাহিষ্য, পোদ, মুচি, মেথর সমস্তকে লইয়া দেশ, একা শিক্ষিতের দেশ নয়, একা আন্দোলনকারীর এতে অধিকার নাই, কিন্তু পাশ্চাত্যমোহে আমরা সবই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলার মূর্ত্তি গড়িলেন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। বঙ্গ জননীকে দর্শন করিলেন। সেই "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্" তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল। কিন্তু আমরা ত সে মূর্ত্তি দেখিলাম না; সে গান শুনিলাম না। তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।"

"আজ বাঙ্গলার জীবন্ত প্রাণের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গলার

প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গলার ইতিহাসের কতকটা ধারা বুঝিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির গান মনে হইল, মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান সবই যেন এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল।—কবিওয়ালাদের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে জাগিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধনসঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম কেন ইংরাজ এ দেশে আসিল। বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম্ম কি? আর বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে—
বাহুতে তুমি মা শক্তি—
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

সেই মাকে দেখিলাম, চিনিলাম। বঙ্কিমের গান সেই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল। বুঝিলাম রামকৃষ্ণের সাধনা কি, সিদ্ধি কোথায়? বুঝিলাম কেশবচন্দ্র কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণী শুনিলাম, বুঝিলাম বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার

সে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি স্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারে রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটী বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেইরূপের মূর্ত্তি, আমার বাঙ্গলা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ যখন জাগিলাম, মা আমায় আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সেইরূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম সেরূপ বিশিষ্ট, সেরূপ অনন্ত। তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সেরূপের বালাই লইয়া মরি।

শিক্ষা-দীক্ষার কথা

"পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ করাই শিক্ষার বিশিষ্ট কার্য্য। তাই শিক্ষাই বাঙ্গলার মাটির দান, তাহার প্রাণের বাণী। এই শিক্ষার কার্য্য পুরাকালে আমাদিগের দেশে অনেক প্রকারে সাধিত হইত, গুরুর গৃহে, সংসারের সকল অনুষ্ঠানে, পল্লীতে পল্লীতে যাত্রাগানে, কবিগানে, কথকতার মধ্যে, ভাগবত পাঠে, রামায়ণ গানে, চণ্ডীর গানে, ধর্ম্মঠাকুরের কথায়, হরিসভার সংকীর্ত্তনে, মেয়েদের ব্রত-উদ্‌যাপনে—এইরূপ নানা প্রকারে আমাদের দেশে সরল উপায়ে শিক্ষার বিস্তার হইত। দেশের বড় বড় টোলে বিক্রমপুরে, নবদ্বীপে, কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্যে শাস্ত্র ও দর্শনের সাহায্যে আমাদের দেশের সেই সরল শিক্ষাই আরও গভীরভাবে প্রচারিত হইত। যে দেশের চাষারা চাষ করিতে করিতে—

"মন রে তুমি কৃষি-কাজ জান না,
এমন মানব জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা"—

এই বলিয়া গান ধরে ; যে দেশের মাঝিরা দাড় টানিতে টানিতে—

"মন মাঝি তোর বইঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না—"

বলিয়া তান তোলে ; যে দেশের মেয়েরা—

"তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন"—

বলিতে বলিতে তুলসী-তলায় সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করে ; যে দেশে পণ্য ব্যবসায়ী হাট হইতে ফিরিবার সময় খেয়া পার হইতে হইতে—

দিন ত' গেল সন্ধ্যে হ'ল
হরি, পার কর আমারে—

বলিয়া গান গায়, যে দেশে তর্পণের শেষ কথা "আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং জগৎতৃপ্যতু", যে দেশে সকল কর্ম্মে ও সকল কর্ম্ম শেষে প্রাণ মন খুলিয়া "বিষ্ণু প্রীতি কামনায়" বলিয়া অঞ্জলি দান করিতে হয় ; যে দেশের মাটীতে বিশ্বরাজ্যের, প্রাণরাজ্যের সকল রূপ, সকল রস, সকল সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়া সকল জ্ঞান-সমুদ্র শোষণ করিয়াও ভগবৎ প্রেম ও করুণায় নিজেকে ডুবাইয়া, মহাপুরুষ ভোগের বীরত্বে, ত্যাগের বীরত্বে তারস্বরে বলিয়া উঠেন—

ন ধনং ন যৌবনং সুন্দরীং কবিতাং মা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ অহৈতুকী ভক্তির্ত্বয়ি।

সেদেশের শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ কি এবং কিরকম সহজ সরলভাবে শিক্ষার বিস্তার হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না।"

ইহার সাত বৎসর পরে (১৯২৪ খৃঃ)—চিত্তরঞ্জন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কাঁটালপাড়ায় যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেও তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা কম পরিস্ফুট হয় নাই। তিনি বলেন—

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একজন ব্যক্তি নহেন—যদিও তিনি খুব ব্যক্তিত্ব-শালী পুরুষই ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ। বঙ্কিম-সাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস—দুই-ই।

"আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নামগন্ধ ইহাতে নাই। ইহাতে Comte-র Positivism থাকিতে পারে, Europe এর দুর্দ্ধর্ষ Nation idea থাকিতে পারে, বিলাতী Romanticism থাকিতে পারে। আর্টের মাপকাঠিতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনায় অপরিহার্য্য ত্রুটি থাকিতে পারে—পারে কি, হয়ত আছে; কিন্তু তথাপি ইহাতে বাঙ্গালী আছে—যে অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শে এমন কি ভারতীয় আদর্শেও কাহারও নিকট মাথা নত না করিয়া সে দাঁড়াইতে পারে। আমি আবার বলি, বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন—অন্য কিছু হইতে বলেন নাই।……

বঙ্কিম সাহিত্যের উপর Europe-এর সাহিত্য দর্শন ও ধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তথাপি বঙ্কিম সাহিত্য—আত্মস্থ, সমাহিত, তেজঃপূর্ণ অথচ প্রশান্ত ও গভীর। ইহা সমুদ্র বিশেষ।

সাহিত্যক্ষেত্রে—বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত ও সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ও গিরিশ চন্দ্রে যতই পার্থক্য থাকুক; বঙ্কিম ও গিরিশচন্দ্র যুগের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মান বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, প্রতিভার বরপুত্র এই দুই মহাকবিই য়ুরোপের সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও সাহিত্যের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া সব্যসাচীর মত বাঙ্গালীর যুগসাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহারা উভয়েই স্রষ্টা ও কবি, বাঙ্গলার—এমনকি জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহারা অত্যন্ত উচ্চস্তরের কবি। ইহারা পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন নাই, যেমন ইহাদের পরবর্ত্তী নাটক নভেলে অন্যান্য ঔপন্যাসিক ও নাটক রচয়িতাগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং মহাদুঃখের বিষয় যে তাহা করিয়াও তাঁহারা বাহবা লইতেছেন!

"বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে যাহা

ফরাসী দেশে Voltaire, Rousseau সাহিত্যে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই দিক হইতে বঙ্কিম-সাহিত্যের সহিত Voltaire, Rousseau সাহিত্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিতে আপনাদের কেহ কেহ প্রবৃত্ত হউন, কারণ কোন কোন দিকে বঙ্কিম বাঙ্গলার ভলটেয়ার—”

এই অভিভাষণের উপসংহারে দেশবন্ধু কমলাকান্তের “আমার দুর্গোৎসব” হইতে একটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া পড়েন। প্রথমে পড়েন—এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব দিগ্‌ভূজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রু মর্দ্দিনী বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।”

পড়িতে পড়িতে দেশবন্ধুর মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহার পরেই যখন পড়িতে লাগিলেন—

“দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পুরিল! তখন যুক্তকরে সজল নয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব। এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব। উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা।

উঠ, উঠ মা, বঙ্গজননী। মা উঠিলেন না, উঠিবেন না কি মা!

এইখানে চিত্তরঞ্জনের চক্ষু হইতে দরদর ধারে অশ্রু বর্ষিত হইতে

লাগিল, তিনি বিষাদগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। ইহার পরে আবার যখন পড়িলেন—

"এসো ভাই সকল! আমরা সকলে এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। চল, চল, অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব! মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

প্রথমে যখন ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করেন, তখন মনে হইয়াছিল সমাগত সকলকেই লইয়া তিনি যেন কাল-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চলিয়াছেন। ইহার পরে যখন বলিলেন—না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি! তখন প্রকৃতই ভাবাবেশে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল, তাঁহার দেহ স্ফীত ও কম্পিত হইয়া উঠিল, মনে হইল যেন প্রকৃতই মাতৃভূমি উদ্ধারে কালসমুদ্রে মায়ের উদ্ধারে রত রহিয়াছেন। অভিভাষণের পরে অতিকষ্টে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন! তখন একটা ভাবের স্রোত সেই বিশাল জনমণ্ডলীতে বহিয়া গেল।

বঙ্কিমতীর্থে মাতৃপূজার সেবক আর দ্বিতীয় বোধ হয় কেহ আসেন নাই, আসিবেন না কি?

এই সময়ে দেশবন্ধু কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাটি হয় হেদোতে—Central Swimming Club-এর উদ্যোগে। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস হাসিয়া বলেন—

"এখানকার সভ্যগণ সাঁতার কাটেন পুকুরে, আর সভাপতি মহাশয় বিচরণ করেন সাগরে, তাঁহার চিন্তাধারা ও কর্ম্মশক্তি সবই সাগরের মত মহান্ ও সুগভীর।"

সে হাসিতে দেশবন্ধুও যোগদান করেন।

অতঃপর দেশবন্ধু নাতিদীর্ঘ একটী প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের রচনা-প্রতিভার উল্লেখ করিয়া যখন পড়িলেন—

"ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয়-ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেমন হাসি।
মুক্তকেশী গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে—
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থ-বরদ বঙ্গে—"

"বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
চরণতলে সপ্তকোটি সন্তান তোর মাগেরে
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দেমা রাগিয়ে দে তোর নাগেরে।"

বলিতে বলিতে আবার চিত্তরঞ্জন অশ্রুসিক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

'আহা, এই তো আমার মনের ভাব্‌টি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমিও তো এই মহাব্রতে দীক্ষিত মানুষই চাই, যে মানুষ আমার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া আসিবে। পাব না কি মানুষ? যদি না পাই, যদি কেউ আমার সঙ্গে আসিতে না চায়—আমি নগর, জনপদ ছাড়িয়া, গ্রাম ছাড়িয়া পল্লী ছাড়িয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইব। সেখানে আমার কথা বাঘকে শুনাইব, সাপকে শুনাইব; বাঘ জাগিবে, সাপ উঠিবে, কিন্তু তবু কি মানুষ পাইব না?"...

দেশবন্ধু কাঁদিলেন, সকলেই কাঁদিল, কিন্তু কেহ কি তাঁহার সঙ্গী হইল?

আবার ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে কর্পোরেশন এবং কাউন্সিলে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিবার পরে দেশবন্ধু কতকটা স্থির হইয়া বসিয়াছেন, গিরিশ-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে মহাকবির স্মৃতিসভায় যে সভাপতির অভিভাষণ দেন, তাহাতে আবার রাজনীতি ছাড়িয়া চণ্ডীদাস রামপ্রসাদের সুরের

গুঞ্জন বাজিয়া উঠে। অভিভাষণের কতকাংশ এইখানে দিলাম। সেই সভায় প্রথমে বক্তৃতা দিয়াছিলেন স্বামী অভেদানন্দ, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বরাজনেত্রী হেমপ্রভা মজুমদার, বর্ত্তমান লেখক, স্বর্ণলতা দেবী প্রভৃতি। দেশবন্ধু বলেন :

"তিন বৎসর পূর্ব্বে ভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, স্বরাজ ছাড়া কোন কথা কহিব না, স্বরাজের কার্য্য ছাড়া অন্য কোন কার্য্য করিব না, স্বরাজের চিন্তা ছাড়া অন্য আর কোন চিন্তা করিব না, স্বরাজের সভা ছাড়া অন্য কোন সভায় যোগদান করিব না। তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আজ কেন এই নাট্যকারের স্মৃতি-সভায় যোগদান করিলাম? ইহার উত্তরে বলিব স্বরাজ কাহাকে বলে? স্বরাজ—নিজের মূর্ত্তি যাহাতে প্রকাশ পায়—তাহাই স্বরাজ। আমার স্বরাজ অর্থে সমস্ত জিনিস এসে পড়ে—নিজেকে যেখানে প্রকাশ। গিরিশের সৃষ্টিতে আমরা স্বরাজ্যেরই অভিব্যক্তি পাই।

"কবিকে চিনিতে গেলে—তাঁর রচনার ভিতর হইতে—তাঁর কার্য্যের ভিতর হইতে তাঁকে চিনিতে হয়। গিরিশের লেখার মধ্যে স্বরাজের কথা আমি প্রচুরভাবে পাই, তাই এই সভায় আজ আমি স্বরাজের সভাজ্ঞানেই সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি। বেদান্তের কথা দুই একটা বলিলে আমার বোধ হয়—একেবারে অনধিকার চর্চ্চা হবে না। বেদান্তে বলে—ভগবান এক, আবার বহু—এই নিয়েই তো বেদান্তে ঝগড়া। কেউ বলেন এক—কেউ বলেন বহু। একের মধ্যেই আমরা বহুকে পাই, আবার বহুর মধ্যেও একেকেই উপলব্ধি করি। কতকগুলি দেশ লইয়াই যে বিশ্ব—তাহা নহে,—এই ফুলের (টেবিলের উপর ফুলের তোড়া দেখাইয়া) মধ্যেই বিশ্ব রহিয়াছে। যিনি ধ্যানস্থ হইয়া দেখিবেন—তিনিই দেখিতে পাইবেন। আমি আমার সম্পাদিত "নারায়ণ" মাসিক পত্রে একটি স্তব লিখিয়াছেন—'হে ভগবান, তুমিই এক এবং তুমিই বহু;

তোমাকে নহিলে আমাদের চলে না, আবার আমাদের নহিলেও তোমার চলে না।' গিরিশচন্দ্রকে আমি **মহাকবি** বলি কেন? যাঁর কবিতায় ধর্ম্ম নাই—সে কবি অনেকদিন বাঁচে না। মহাকবি বলি কাকে?—যাঁর কবিতায়—যাঁর রচনায়—জাতীয়তা আছে, ধর্ম্ম আছে—তাঁহাকেই মহাকবি বলি। চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত আমি আমার "নারায়ণ" পত্রে দেখাইয়াছি—কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কতবার উত্থান ও পতন হইয়াছে। চণ্ডিদাসের পর মহাপ্রভুর সময়ে এই ভাব বিশেষ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর আবার ভারতচন্দ্রের সময় অনেকটা মলিন হইয়া যায়, পরে রামপ্রসাদে তাহা আবার জাগিয়া উঠে, রামমোহনের সময় হইতে আবার উহা মলিন হইয়া পড়ে, আবার এই গিরিশ ঘোষে তাহা জাগিয়া উঠাইয়াছিল। গিরিশবাবুর কবিতায়—গানে আমরা জাতীয়তা পাই, প্রাণ পাই,—দেশের একটা স্বরূপ-মূর্ত্তি দেখিতে পাই,—ইহাই তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। "যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে," গানটিতে সেই বৃন্দাবনের মোহন বাঁশীর ধ্বনিই যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠে। গিরিশচন্দ্রের কবিতা যাচাই করিতে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, জার্ম্মানীতে যাওয়ার প্রয়োজন হইবে না। তাঁর কবিতায় বিলাতী ভাব নাই, তাঁর কবিতার ভাব ধার করিতে তাঁকে বিদেশে যাইতে হয় নাই। গিরিশচন্দ্র খাঁটি দেশী কবি,—তিনি দেশীয় ভাবে—দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছেন—দেশের প্রাণের কথা ফুটাইয়াছেন—দেশের সুখ-দুঃখ, অভাব আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি মহাকবি, দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। এমন একদিন আসিবে, যে দিন সমস্ত জগৎ ভারতের দ্বারে আসিয়া নতজানু হইয়া ভারতের ধর্ম্ম, সাহিত্য, কাব্য, নাটক আলোচনা করিবে, তখন গিরিশচন্দ্র স্বরূপ-মূর্ত্তিতে তাঁদের নিকট প্রকাশিত হইবেন, এবং তখন তাঁরা জানিতে পারিবেন—গিরিশচন্দ্র কত বড় কবি, স্রষ্টা ও নাট্যকার।

এখানে শ্রোতৃবৃন্দকে তিনি আনন্দরসেই আপ্লুত করিয়াছিলেন। তিনিও সভায় আসিয়া পরমানন্দই লাভ করেন। সভার শেষে গিরিশচন্দ্রের পুত্র দানিবাবু প্রমুখ অভিনেতৃমণ্ডলী তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করেন। তিনিও বিশেষ বিনয় সহকারে আলাপ করেন।

এইরূপ বহু সভায় তিনি যে সমস্ত অভিভাষণ দেন, তাহাই এক একখানি সাহিত্যের কাব্য। সাহিত্য হইতে তাঁহার জীবন ছিল অবিচ্ছিন্ন এবং সে সাহিত্য খাঁটি বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য, সাহিত্য বাঙ্গলার প্রাণের জিনিষ।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু দাশের ধর্ম্মমত বড় বিচিত্র। ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও পরে তিনি হিন্দু হইয়াছিলেন, তিনি দেবদেবী মানিতেন, শালগ্রাম শিলা নারায়ণের সম্মুখে পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং হিন্দুর পূজা-অর্চ্চনায় তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস ছিল। জগন্মাতা রামপ্রসাদকে যে বেড়ার বাঁধ দিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, একথা তিনি সত্যই মানিতেন।

আবার তিনি শাক্তও ছিলেন, বৈদান্তিকও ছিলেন, বৈষ্ণবও ছিলেন। তন্ত্রপ্রধান বাঙ্গলা দেশে কোনরূপ তান্ত্রিক সাধনা না করিয়াও তন্ত্রের প্রভাবেই তিনি অসাধারণ তেজস্বী বীর হইয়াছিলেন। আবার বৈদান্তিকের ন্যায় তিনিও মনে করিতেন, "আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী।" দ্বৈতাদ্বৈত বাদীর মত তিনি মনে করিতেন ঈশ্বর এক, তিনিই দুই— এই দুই মিলিয়াই আবার তিনি এক। আবার তিনি যে পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার "অন্তর্য্যামী", "কিশোর কিশোরী", কীর্তন গান এবং অসংখ্য প্রবন্ধ তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। বিশেষতঃ তাহার কার্য্যাবলীই বিশিষ্ট প্রমাণ। চাক্ষুষ দেখিয়াছি যাহাকে টাকা দিবেন বলিতেন, দ্বিতীয় দিন আসিলেই তিনি হাতজোড় করিয়া এমন কাতরতা দেখাইতেন, মনে হইত যেন ঐ ব্যক্তির নিকট তিনি অপরাধী। ঐ ব্যক্তিই পাওনাদার আর তিনিই দেনাদার। দান করিতেও এরূপ বৈষ্ণবের বিনয় কুত্রাপি দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া কিরূপে তাঁহার ধর্ম্মমত পুষ্ট হয়,

কিরূপে তিনি জড়বাদ, শূন্যবাদ মায়াবাদ হইতে ভক্তিমার্গে পৌছিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হন, কিরূপে কীর্ত্তন সঙ্গীতে অবশ হইয়া পড়িতেন, মধুর আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাঁহার হৃদয়ে প্রেমধারা স্রোতস্বিনীর মত হাসিত খেলিত, আবার স্বরাজ সাধনায় বাহ্যতঃ উহা কিরূপ বন্ধ ছিল, আবার শক্তিসাধন করিয়াও 'নাম' করিতেন, কিরূপ অপার আনন্দ পাইতেন সেই তত্ত্বানুসন্ধান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ একদিকেই তো তাঁহার সম্পূর্ণ উচ্চাবস্থা হয় নাই—ফুলতো তাহার ভরা রূপের ডালি লইয়া একদিনেই ফুটে না। তাহার ফুটনের জন্য যে বহু আয়োজন আবশ্যক। তাই কবি যেন নিজের জীবনের বিবর্ত্তন ও বিকাশের কথা নিজেই তাঁহার "কিশোর কিশোরীতে" বিবৃত করিয়াছেন :—

কেমন উঠিবে ফুটি শুধু একদিনে
আরে আরে ফুল যবে হেসে ফুটে উঠে
শ্যাম পল্লবের বুকে, সুখ সূর্য্য করে
একটি প্রভাত লাগি, এক নিমেষের
মাঝে, সে কি শুধু সেই মুহূর্ত্তের লীলা?
তার তরে করেনি কি আয়োজন
সমগ্র জীবন লীলা যুগ যুগান্তর,
জন্ম জন্মান্তর ধরে? অনন্তাকাশের
শুভ সঙ্গীতের মাঝে উঠে সে ফুটিয়া,
ফুটেনা, ফুটেনা ফুল শুধু একদিনে

তাঁহার বিভিন্ন সময়ের মানসিক অবস্থা যে তাঁহার কবিতারাজিতে প্রতিভাত হইয়াছে তাহা আমরা মালঞ্চ, মালা, সাগর-সঙ্গীত, অন্তর্য্যামী ও কিশোর কিশোরী হইতে দেখিয়াছি—তবে যখন যে অবস্থাই থাকুন জগতের লোক যে তাঁহার প্রাণ, একথা যৌবনের

কবিতারও স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি দরদহীন, ধনী, অহঙ্কারী লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—

তুমি উচ্চ হ'তে উচ্চ, ধার্ম্মিক প্রবর!
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ,—
ওগো কোন্ শূন্য হ'তে আনিয়া ঈশ্বর,
জীবন তাহারি কর আরতির গান?
ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়োনা ফিরিয়া
ধরনীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক্
উৰ্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া
প্রাণপুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্!
রক্তহীন রিক্ত হস্ত কঙ্কাল জীবন
সব রক্ত করে প্রাণ ঈশ্বর তোমার!

এই দরদ লইয়াই তিনি অভিশাপ কবিতায় স্পষ্ট বলিয়া দেন, ধরণীর দুঃখ দৈন্য দূর করাই হইবে প্রধান কাজ। তিনি স্বর্গ সহচর গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন আমার স্বর্গসুখে প্রয়োজন নাই, ধরাবাসীগণের আর্ত্তনাদ বজ্রশেল সম আমার মর্মে বাজিতেছে—তাই—

কাঁদ কাঁদ ধরাবাসী! তব তীব্র আর্ত্তনাদ
বজ্রশেল সম,
সহস্র-সম্ভোগ-ভরা কম্পিত এ স্বর্গধামে
বাজে মর্ম্মে মম।

এই মন লইয়াই মহাপ্রভুর জীবন্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত চিত্তরঞ্জন বিনা আয়াসে সব ছাড়িয়া দিতে সক্ষম হন। তাই মহা-সম্মেলনীর মহা-সভায় দাঁড়াইয়া তিনি সর্ব্ব-সমক্ষে বলেন "মহাপ্রভুর দেশে ত্যাগ সম্ভব নয়, একথা মানিতে প্রস্তুত নই। ত্যাগ তো বৈষ্ণবেরই ধর্ম।"

তিনি বরাবর বলিতেন মহাপ্রভুর চরিত্র প্রভাবেই তিনি সমগ্র বিলাস-বসন বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাগর সঙ্গীত রচিত হয় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। তিন বৎসর পরে যখন উহা প্রকাশিত হয়, তখন সুন্দর একখানি অংকিত সাগরের ছবির মধ্যে বিদ্যাপতির একটি কবিতার অংশ একটি পদ জুড়িয়া যেন গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি যব তুঁহু করবি বিচার।

তিনি বলেন ইহাতে আমার গুণ লেশও নাই। বৈষ্ণবের ধর্মই বিচার ও দীনতা—বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচেন। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও দর্প যাহার গুণরাশি বিন্দুমাত্র মলিন করিতে পারে নাই। তাঁহার উক্ত পদটিতে বৈষ্ণবের গুণই প্রকটিত হইতেছে। বস্তুতঃই তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, পরম হরিভক্ত।

বৈষ্ণব যেমন শেষ বিষয় ভোগও রাখেনা। সনাতন যেমন কাশী-ধামে ভোটা কম্বল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন বৈষ্ণবে, প্রধান দেশবন্ধুও শেষ সম্বল বাড়ীটুকু পর্য্যন্ত সর্ব্ব-সাধারণের হিতার্থে ছাড়িয়া দিয়া যান—

"প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয় রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥"

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ।

যে সমস্ত প্রবন্ধ ও কবিতার আভাষ পূর্ব্বে দিয়াছি তাহার পুনরুক্তি করিব না। কিন্তু কিশোর কিশোরী ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কথা কিছু উল্লেখ প্রয়োজন। বৈষ্ণবের নিকট রাধাকৃষ্ণ মিলন আত্মায় আত্মার রমণই শ্রেষ্ঠাবস্থা। রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বলেন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য যাহাই বল "কান্তভাব প্রেমসাধ্য সার", মহাপ্রভু

ব্যগ্র হইয়া কহিলেন—'রামানন্দ বল বল রাধাকৃষ্ণের বিলাস বিবর্ত্তনের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে—
এই যে ভেদ-বুদ্ধি শূন্য যুগল প্রেমের বিলাস বিবর্ত্তন, ইহাই কল্পনার শ্রেষ্ঠ রূপান্তর।

এই শ্রেষ্ঠ ভাবই কবি চিত্তরঞ্জন প্রাণ প্রতিষ্ঠায় প্রতিফলিত করিয়াছেন। কিন্তু এই গল্পটি পড়িবার আগে 'ডালিম' গল্পটি পড়া আবশ্যক, কারণ ডালিম প্রাণ প্রতিষ্ঠারই পূর্ব্ব রাগ।

সমাজের নিগ্রহে ডালিমকে কলিকাতায় আসিয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হয়। ডালিম শৈশবে পিতৃমাতৃহীন, কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত, মামা নেশা করিতেন, মামী তাহাকে বোকা মনে করিত। ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হয় এক পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স্ক বিদেশে চাকুরের সহিত। তাহার আরও দুই পক্ষের ৪।৫ টি ছেলে মেয়ে ছিল। বাড়ীতে আসিলে দুই একবার দেখা হয়, কখনও কথা হয় না। বাড়ীতে তাহার বিমাতা বধু ডালিমকে বিশেষ যাতনা দিত, গালি দিত, প্রহার করিত, একদিন তাহার সম্বল বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিল। যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় ডালিম একটি ছেলের সঙ্গে মামার বাড়ী নৌকা করিয়া চলিয়া যায়। মামী স্থান দিলেন না। 'গোল্লায় যাও' বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ফিরিয়া আবার স্বামীর বাড়ী যায়, শাশুড়িও দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ঐ ছেলেটির সঙ্গে ডালিম কলিকাতায় গেল, সে এক জমীদারের ছেলে, বাড়ী ভাড়া করিয়া একসঙ্গে থাকে; তারপরে সে এখন কলিকাতার বিখ্যাত বারবিলাসিনী অপার ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ডালিম বিবি।

একদিন ইয়ার বন্ধুগণের বাগানের আমোদে সকলেই যখন মত্ততায় বিবশ, ডালিম একটি যুবকের সঙ্গে পুকুরধারে লতামণ্ডপের অন্ধকারে

চলিয়া আসে। একদিনের পরিচয়েই উভয়েই উভয়কে প্রকৃতই ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু ডালিম প্রেমাস্পদের সঙ্গে রক্তমাংসের ভালবাসায় কাদা মাখা মাখী না করিয়া সেই প্রেমিকের প্রেমটুকু সম্বল করিয়া বাড়ী ঘর ঐশ্বর্য্য সব ছাড়িয়া কোথায় বিরাগী হইয়া চলিয়া যায়। প্রেমাস্পদের কাছে তাহার শেষ লিপিটুকু এই—

"তুমি আমাকে খুঁজিতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আর খুঁজিও না। আমাকে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। মনে করিও আমি মরিয়া গিয়াছি। আমি মরি নাই, মরিতে পারিব না! তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এজীবনে কখনও পাই নাই। তাহারি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। অনেক দুঃখ সহিয়াছি। সংসারে যাহাকে সুখ বলে তাহাও পাইয়াছি, কিন্তু কাল রাত্রে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি, ইতিপূর্ব্বে তাহা কখনও পাই নাই। তাহার স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি তাহা আর হারাইতে চাই না।

তুমি আমাকে খুঁজিও না। প্রাণ সর্ব্বস্ব! আমি বড় দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমার দুঃখ বাড়াইও না। এ জন্মে হইল না। জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই।"

ডালিম।

এ গল্পটির সে সময়ে খুবই আদর হইয়াছিল। অনেকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে চিত্তরঞ্জন এত সুন্দর গল্প লিখিতে পারেন। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "স্বামী" উপন্যাস খানি 'নারায়ণে' বাহির হয়। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেন—

"ডালিম কার লেখা ?"

চিত্ত—আমারই।

শরৎ—আপনি ছোট গল্পও লেখেন ?

চিত্ত—হাঁ, দুঃসাহসের অন্ত নাই !

ডালিম রচিত হয় মিহিজামে (এস, পি, চাটার্জ্জির বাড়ীতে) ১৯১৪ সালের পূজাবকাসে। ব্যারিষ্টার শ্রীশচন্দ্র বসুও সেখানে ছিলেন। বাগানটির ছায়া লওয়া হয় দমদম ভূতনাথ পালের বাগানের।

"কাঁটা বনে তুলতে গিয়ে কলঙ্কেরি ফুল !

ওগো সই কলঙ্কেরি ফুল।"

সঙ্গীতটি শ্রীশ বসুর সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করিয়া সংযোজিত হয়।

'ডালিম' গল্পে রক্তমাংসের ভালবাসা অতিক্রম করিয়া প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম পরিস্ফুট হইয়াছে। বহুদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া ডালিমকে না পাইয়া বৃদ্ধবয়সেও নায়ক অনুভব করিতেছেন—

"সে যে অদৃশ্যভাবে আমার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—ধরা দেয় না। তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই, তাহাকে দেখিতে পাই না। চোখ বুজিলে তাহাকে বুকের ভিতর পাই, চোখ মেলিলে কোথায় মিলাইয়া যায়। আজও তাহাকে খুঁজিতেছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল খুঁজিতে খুঁজিতে কাটিয়া যাইবে। তাহাকে কি পাইব না ? আমি যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি"।

Realism অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ মিশ্রিত ভালবাসা বহুদিনব্যাপী অনুপস্থিত ডালিমের জন্য বৃদ্ধ বয়সে নায়কের আর নাই। তথাপি অদৃশ্য প্রেমিকার প্রতি তাহার ভাব ও ভালবাসা অনেক উচ্চতর স্তরের। ক্রমে এই materialism অর্থাৎ রূপ রস স্পর্শ গন্ধ জনিত ভালবাসাই "প্রাণপ্রতিষ্ঠায়" একেবারে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কোঠায় পৌছিয়াছে। এই পরিণতি বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জন অপূর্ব্বভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

স্বরচিত 'কিশোর কিশোরী' অবলম্বন করিয়া তিনি "রূপান্তরের কথার" প্রসঙ্গে প্রেমের বিভিন্ন স্তর দেখাইয়াছেন। পূর্ব্বে "কিশোর

কিশোরী”তে যে একাত্ম মিলনের আদর্শ পাইয়াছি কবি নিজেই তাহার ব্যাখ্যা এই 'রূপান্তর' প্রবন্ধটিতে করিয়াছেন। তাঁহার কথায়ই বিষয়টি বুঝাইয়া বলিতেছি :

“আমাদের সকলের জীবনেই পার্থিব ভালবাসা হইতে ভগবদ্‌প্রেমের পরিণতি সাধিত হইতে পারে। ইহাকেই বলে রূপান্তর। যেমন একটী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমেই প্রেমের উন্মেষ হয়, প্রেম জাগিবার আগে সেই নারীর যে রূপ দেখিয়াছিলাম তাই কি তার যথার্থ রূপ? অনুরাগের অবস্থায় যখন তাহাকে দেখি, তখন যে প্রাণ দিয়া দেখি, তখন যে আমার প্রাণকে দেখিতে পাই এবং সেই প্রাণের যে চক্ষু সেই চক্ষু দিয়া তাহাকে দেখি! তখন যে

স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ মূরতি
সকল চাঞ্চল্য ভরা অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে

'ডালিম' গল্পের নায়ক ডালিমকেও এই ভাবে দেখিয়াছিল। কবি বলেন “বারবারের মতই আমরা প্রাণের সাক্ষাৎ পাই, ততই যে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ী হইয়া উঠে! অনুরাগ গাঢ় হইলে—

আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ
প্রাণস্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ!

তারপরে সেই মূর্ত্তি যে আমার ধ্যান ধারণার বিষয় হইয়া পড়ে!

সেই—সেই তরঙ্গিত পরাণ-মূরতি
সকল চাঞ্চল্য ভরা অচঞ্চল গতি।
সকল লাবণ্যে গড়া রূপে ঢল ঢল
পরাণ-তরঙ্গে সেই স্থির শতদল

সঘন গগনে স্থির চপলার মত
উজ্জলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত।
সকল করম মাঝে সব কামনায়
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায়!
সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়,
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়।
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায়!

তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেই শুভক্ষণে তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, সে যে আমার মাহেন্দ্রক্ষণ—সেই মুহূর্ত্তেই যে আমার জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত! আমি আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহারও সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

সেই যে মুহূর্ত্ত মোর, তুমি মূর্ত্তি তার
নহ মিথ্যা! সত্য তুমি! সত্য রূপাধার!
অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর
রূপ-রস-গন্ধ-ভরা আত্মার মন্দির!
পদতলে কলকলে কাল উর্ম্মিমালা
শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপজ্বালা

তখনই আমার মনে হয় যে, এই প্রেম যে অনন্তের পথে যাত্রা করাইয়া দিয়াছে। একটা অপূর্ব্ব শুদ্ধ পবিত্রভাবে প্রাণমন ভরিয়া যায়। মনে হয়, কোথায় কাহার সন্ধানে চলিয়াছি। যাহাকে দেখিয়া প্রেমের উন্মেষ হয় সে যেন কোন্ মহাদেবতার জাগ্রত জীবন্ত বিগ্রহ, কাহার উদ্দেশে অভিসার করিয়াছি, কোন্ মহাসাগরের দিকে আমার জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে। তখনই বাঞ্ছিতকে বলি—

রাখ বুকে বুক। করগো হৃদয়ঙ্গম!
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন্ সাগর সঙ্গম
পানে বহে চলিয়াছে, দিবস রজনী
কার পিছে পিছে, শুনি কার শঙ্খধ্বনি!

তারপর এই প্রেম যখন আরও গাঢ় হয় তখন প্রাণের দুইটী তীর ভাসাইয়া দেয় এবং সেই স্রোতের মধ্যে কত কি জাগিয়া উঠে! তখনই গাহিয়া উঠি—

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথি মালা!
যে দীপ জ্বালেনি ওরে! সেই দীপ জ্বালা!
অন্তরের অঙ্গে অঙ্গে
কে দিল বুলায়ে রঙ্গে?
যে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুলে গাঁথা মালা!
এই যে হৃদয় মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে!
যে দীপ জ্বলেনি আগে
ওরে! তারি আলো জ্বালা।

ডালিম ও তাহার নায়কের মধ্যে এই সব অবস্থা হইতে পারে নাই কেবল আভাষ মাত্র ছিল। কবি বলেন—

"তারপরেই মনে হয়, এই যে প্রেমের খেলা এ যেন তিনজনের খেলা —একজনের লীলা। সেই একজনের চরণ নুপুরের রুণুধ্বনি প্রাণের মধ্যে শুনিতে পাই, সে যে হাসিয়া হাসিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া আমার প্রাণের মধ্যে নাচে। এই প্রেমের যত না মাধুর্য্য সবই যেন নিজে আস্বাদ করে। আমরা যেন তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া আনন্দ

মন্দিরে তাঁহারি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিই। তখন আমাদেরও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। তখনই প্রেমিক গাহিয়া উঠে—

ওরে দেখ্, দেখ্, দেখ্, কি জানি জেগেছে,
হৃদয়-কমল মাঝে কি ধূম লেগেছে!

*   *   *   *   *

কে নেয়রে মধু মিটি
হেসে হেসে কুটি কুটি?
তানে তানে মধু ঢালি
কে দেয়রে করতালি?
মধুর তরঙ্গে
কে নাচেরে রঙ্গে?
ওরে দেখ্ দেখ্, কি ধূম লেগেছে
পরাণ কমল মাঝে কি জানি জেগেছে।

যখন দেখিলাম, হৃদয়ের মাঝে "কি জানি জেগেছে" পরেই দেখিলাম "কে জানি জেগেছে।" তখনই উপলব্ধি করিলাম যে, এ প্রেম ধন্য, তখনই আমার যে প্রেমের সহচর, তাহার দিকে চাহিয়া গাহিয়া উঠিলাম—

যুগে যুগে পাওয়া পাওয়া না-পাওয়া মিলন
যেন রে সার্থক হ'ল, পুরিল জীবন!
ওগো ফুল! ওগো মিষ্টি!
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি!
ধন্য আমি, ধন্য তুমি,
পুণ্য সে মিলন-ভূমি!

তখন যে আমার হৃদয়বিহারী করতালি দিয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন, আমি আবার গাহিলাম—

কে বলেরে ধন্য ধন্য
কে দেয়রে করতালি?
তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে?
কে বলেরে ধন্য ধন্য
এ কার নূপুর বাজে?
কার পদরজঃ
পরাণ পঙ্কজ
শোভা করে? হে মিলিত! হে মধু মিলন!
হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি! ধন্য এ জীবন।

কবি চিত্তরঞ্জনের প্রেম রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শজনিত মোহ হইতে কিরূপে বহিরাবরণে আসিয়া অনন্তে মিশিয়া যায় তাহা "কিশোর কিশোরী" হইতে নিজে "রূপান্তরের কথা" প্রবন্ধে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তবে "কিশোর কিশোরীতে"ও সন্ধান দিয়াছেন, উপলব্ধি করাইয়াছেন, আনন্দসাগরে আপ্লুত করিয়াছেন, কিন্তু সেই পরমপুরুষকে তখনও প্রেমিক দেখিতে পান্ নাই। কবি তাই বলেন—

"এই প্রেম ব্রত-উদ্‌যাপন না করিলে তাঁহাকে দেখা যায় না। এই প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। সকল জীব যে—

"ঠেকে গেছে প্রেমের দায়ে"।

কবি বলেন, এক জন্ম হউক, অসংখ্য জন্ম হউক, এই ব্রত উদ্‌যাপিত হইবেই হইবে। যখন সেই শুভক্ষণে প্রেমিককে দেখিবে, তাহার চোখের সামনে প্রাণের মধ্যে তাহার অন্তরে বাহিরে দুই বাহু বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হৃদয়ের হৃদয়বিহারী চিন্ময় চিদানন্দে পূর্ণ আনন্দ-রূপ ঘন রসামৃত-স্বরূপ তাহারই প্রেমের প্রেমিক ভগবান।"

কবি দেখাইয়াছেন ইন্দ্রিয় জগতে যে প্রেমের আরম্ভ, অতীন্দ্রিয় জগতে তাহার পরিণতি।

অনেকে বলিতে পারেন "ইন্দ্রিয় ভোগের যে স্পৃহা, তাহার নাম মুখেও আনিও না, মানুষকে দেবতা করিয়া তোল, কল্পকলার দোহাই দিয়া জীবনকে অপবিত্র করিও না।" কবি চিত্তরঞ্জন উত্তরে বলেন, "মানুষের প্রবৃত্তি—মিথ্যা নয়, কিন্তু এই প্রবৃত্তির মধ্যেও ভগবানের সাড়া পাওয়া যায়। এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে যে, তাহার ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের যে ডাক একেবারেই শুনিতে পায় নাই? কাহারও প্রাণে সেই বংশী-ধ্বনি খুব স্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠে নাই? যদি থাকে তবে তাহার জীবনের কোন অভিজ্ঞতা হয় নাই। সে কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ করিয়া বসিয়া আছে, জীবনের কোন সন্ধান পায় নাই। রূপে রূপে রসে রসে যে লীলা, তাহার ধ্যানগত অনুভূতিই কল্পকলার বিভূতি। কল্পকলাবিদ্ সেই বিভূতি দর্শন করেন এবং আনন্দ-ঘন-রসে মজিয়া যান। চণ্ডীদাস সেই বিভূতি দর্শন করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদের গানেও সেই রূপান্তর হইয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রাণের যে সৌন্দর্য্য, তাহার কল্পকলার যে সৃষ্টি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছে। মহাপ্রভুর জীবনের মত এতবড় কাব্য আর কোথাও রচিত হয় নাই। সাধক রামপ্রসাদ যে রসের আদর্শ আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহার জীবনে ফুটিয়াছে, একথা এখন নাই বলিলাম। চণ্ডীদাসের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল—তাহার সৃষ্টিই তাহার প্রমাণ, রামপ্রসাদের জীবনে রূপান্তর হইয়াছে, তাহার সৃষ্টিও তাহার প্রমাণ।

আমরা বলি চিত্তরঞ্জনের জীবনেও রূপান্তর হইয়াছিল, তাঁহার অনুভূতি, শেষ কয় বৎসরের আদর্শ জীবন, কিশোর কিশোরী, কীর্ত্তন গান প্রভৃতি সৃষ্টিই তাহার প্রমাণ। 'ঝাঁপ দিব এখনি' একমাত্র

চিত্তরঞ্জনই বলিতে পারেন। তিনি 'কিশোর কিশোরী'র অবস্থার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌছিয়াছেন। কিন্তু ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সেই অবস্থাও হইত, কিন্তু ইহার পরেই সকলের মুক্তির জন্য স্বরাজ-সাধনায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

এই রূপান্তরের কতক আভাষ পাই "প্রাণ-প্রতিষ্ঠা" গল্পে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, 'ডালিমে' রূপরসগন্ধ স্পর্শ জনিত প্রেম কতকটা পর্য্যন্ত অতীন্দ্রিয়ের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। পরে "প্রাণ প্রতিষ্ঠায়" তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে—

ডালিমের স্বামীর সঙ্গে দেখা হইত না, সকলেই তাহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আশালতা বালবিধবা, অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাহারও দেহ কলঙ্কিত হইয়াছিল। তবে প্রেমিকের সত্য ভালবাসায় উহা রাস রসময়ী রাধাপ্রেমে পরিণত হইয়াছে।

অসামান্য রূপবতী আশালতা দূর সম্পর্কীয় তাহার তুলি দাদাকে ভালবাসিত, সেই প্রেমিকও তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। লতাই তাহার ধ্যানজ্ঞান, তাহার মনে কোন কুভাব ছিল না; কিন্তু লতাই তাহার আরাধ্য দেবী হইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের মধ্যে প্রাণ-সুন্দরের পূজা চলিত, আশালতা তুলি দাদার কাছে পড়া শিখিত, সে পড়িত আশালতা শুনিত। এইভাবে তাহাদের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একদিন সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই, সন্ধ্যার পূর্ব্বাভাস কেমন ছায়ার মত ভাসিতেছিল। উভয়েরই অকস্মাৎ হাতে হাত ঠেকিল, লতার মাথা তুলি দাদার বুকে ঢলিয়া পড়িল—সে তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই চৈতন্য হইল! তখনই চীৎকার করিয়া বলিল "একি করিলে প্রাণ সুন্দর! বাসনা কি এমন অন্তঃ-সলিলা হইয়া লুকাইয়া থাকে?"

তাহার পূজায় মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল, প্রেমিক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল।

কিন্তু পলাইলেও, আশালতার চিন্তা তাহাকে ছাড়িল না। তাহার কথা মনে হইলেই শিরায় শিরায় রক্ত নাচিয়া উঠে। সে জানিতনা এত বাসনা, এত চুম্বন-পিপাসা, এত আলিঙ্গন লালসা কেমন করিয়া প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছিল। যতই সে নিবৃত্তি নিবৃত্তি বলিয়া নিবৃত্ত হইতে চাহিত, প্রবৃত্তি সাপের মত জড়াইয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিত। মুখে মুখ লাগাইয়া তাহার হৃদয় শোণিত পান করিত। সে বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। যতই সে মুখে দেবতা বলিয়া ডাকিত, প্রাণের মধ্যে ততই কে যেন 'লতা' 'লতা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিত, আর তাহার প্রতিধ্বনি লতা লতা বলিয়া তাহাকে উপহাস করিত। লতা যেন রাক্ষসীর মত তাহার দেহ মন প্রাণ সব গিলিয়া ফেলিয়াছিল।

এইরূপে দিনযামিনী অশান্তি অনলে দগ্ধ হইয়া যমুনায় প্রাণত্যাগ করিতে চলিল। কে যেন পেছন হইতে বলিল "পাগল! পাইয়া ছাড়িতেছিস? লতা যে সত্য সত্যই প্রাণসুন্দরের বিগ্রহ। লতাই যে তোর ইষ্টমন্ত্র! ফের, ফের, জপ কর, ধ্যান কর।"

মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনেক দিন কাটিয়া গেল। শেষে দেখিল মন্ত্র দিবারাত্র আপনি চলিতেছে। সে একটা বিমল আনন্দ অনুভব করিল। ক্রমে এক অপূর্ব্ব আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখা দিল। সে কি লতা? সে কি দেবতা?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড টলমল করিয়া উঠিল—মনসাগরে স্বপ্নবৎ ভাসিতে লাগিল। 'আমি' 'তুমি' ডুবিয়া গেল, শুধু আনন্দ—আমি নাই, তুমি নাই কেহ নাই শুধু আনন্দ, শুধু—প্রেম, প্রেম। এই অদ্বৈতানন্দে ডুবিয়া সে মনে মনে ভাবিল 'লতা তাহার প্রাণসুন্দরীর জাগ্রত বিগ্রহ'।

তুলি দাদা কলিকাতা আসিয়া শুনিলেন লতাদেবী এখন সর্ব্বপ্রধান রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী। কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন না। সে লতার সমস্ত পাপ, সকল জ্বালা, সব কলঙ্ক গ্রহণ করিল। সে তাহাকে আনন্দের পথে লইয়া গেল। অধিষ্ঠাত্রী আশালতা দেবীর এমন ছবি আঁকিতে লাগিল যে উহাতে সখী ভাব, দাসী ভাব, ভক্তের আকিঞ্চন সকলই যেন মূর্ত্ত হইতে লাগিল। আবার করুণার রেখায় এমন করুণাময়ী দেবী হইয়া উঠিল যে, করুণার প্রস্রবণে জননীরূপে অনন্ত মহিমায় জাগিয়া উঠিল। ছবির অপূর্ব্ব শোভায় লতা এখন বৃন্দাবনের মানময়ী রাধায় পরিণত হইল। লতা অস্ফুটস্বরে বলিল "এই আমি আমি? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! এই কি আমি?" তুলিদা বলিল, "তুমি যে জীবন ভরিয়া চাহিয়াছিলে ওই মদন মোহনকে? ওই যে মদন মোহন! ওই যে বৃন্দাবন, ওই যেন বাঁশীর ডাক! তোমার যে শেষ অভিনয় এইখানে!"

তুলি দাদার প্রেম রামীর জন্য চণ্ডীদাসের প্রেমেরই ভিন্নরূপ। কবি চিত্তরঞ্জন "প্রাণ-প্রতিষ্ঠা" গল্প ও "কিশোর কিশোরীতে" সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব কবিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন। এবং সফলকামও হইয়াছেন।

যে কামজ প্রেম ক্রমে রাধাকৃষ্ণের গোপীপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল তাহা কেবল, কবি চিত্তরঞ্জনের কল্পনায়ই নিবদ্ধ ছিল না। তাহার অন্তর্নিহিত প্রেম ও ভালবাসাই কথঞ্চিৎ পরিমাণে কাব্য ও উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ে 'কিশোর-কিশোরী' 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' ও 'রূপান্তরের কথা' রচিত হয়, সেই সময়ে আদালতের কাজ ব্যতীত অবশিষ্ট সময় তিনি বৈষ্ণব কবিগণের অমূল্য রত্নরাজি গ্রন্থ সমূহে ও কীর্ত্তনানন্দে ডুবিয়া থাকিতেন। তিনি মনে করিতেন:

"ভক্তের প্রেম পরিস্ফুট করিবার জন্য কীর্ত্তনের চেয়ে অধিক হৃদয়গ্রাহী জিনিষ আর কিছুই নাই। কীর্ত্তনের সুরই অনন্তের সঙ্গে

মিশিয়া অসীম ভাবময় হয়। তাই কীর্ত্তন শুনিতে তাহার এত আনন্দ হয়।” বৈষ্ণবপদাবলী-বিশেষজ্ঞ গণেশ কীর্ত্তনীয়া ও ভক্ত রামদাস বাবাজীর তাঁহার বাড়ীতে এত আদর ছিল যে তাহাদের মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি প্রায়ই অর্দ্ধবাহ্য দশাগ্রস্ত হইতেন, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দরবার ধারে অশ্রু বিগলিত হইত। ওস্তাদগণের বিজ্ঞান সম্মত গান তাহার প্রাণস্পর্শ করিত না। তিনি রামপ্রসাদের গানে তন্ময় হইতেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ভাবোন্মত্ত হইতেন। কীর্ত্তনের পরেও সময় সময় তিনি কথা বলিতে পারিতেন না। কেহ গর্ব্বিত মনে না করে, তাঁহাকে মাঝে মাঝে কৈফিয়ত দিতে অনেকে শুনিয়াছেন। তিনি বলিতেন “কেহ অপরাধ নিবেন না, আমি কীর্ত্তনের পরে কথা বলিতেই কষ্টবোধ করি।”

চিত্তরঞ্জন অনেক কীর্ত্তন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন এবং গায়কের সহায়তায় উহার সুর সংযোজনা করাইয়া একজন বেতনভুক্ত গায়কের সহায়তায় উহা গান করাইতেন। গানগুলি ভক্তের প্রাণের বিরহ ও মিলনের অপূর্ব্ব সঙ্গীত। তিনি বলিতেন “বিরহের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীগৌরাঙ্গ। রায় রামানন্দের সহিত কথোপকথনে কান্তভাবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই মহাপ্রভু ব্যগ্র হইয়া কহিতেন:

“রাধাকৃষ্ণের বিলাস বিবর্ত্তের কথা শুনিতে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে।”

বিরহ ও মিলনের গানটি চিত্তরঞ্জনের বড়ই ভাল লাগিত। তিনি নিজেই ইহা রচনা করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জন বলিতেন ‘বৈষ্ণবধর্ম্ম খুব ভাল লাগে, কেননা এই ধর্ম্মে ভাবে, ধ্যানে ও কার্য্যে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। অন্যান্য ধর্ম্ম নিজ নিজ মুক্তির জন্য ব্যস্ত, কিন্তু এখানে সকলে একসঙ্গে কাজ করে, কেহই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত নয়।”

তাঁহার ত্যাগ সম্বন্ধে কেহ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেই বলিতেন "ত্যাগ তো মহাপ্রভু-শিষ্যেরই ধর্ম্ম। আর ত্যাগেইতো আনন্দ!"

বস্তুতঃ চিত্তরঞ্জনের ধর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ও সমাজ সংস্কার—সমস্ত বিষয়েরই মূল এই মহাপ্রভু-প্রীতি। তিনি সমস্ত বস্তুতেই ভগবানের লীলাদর্শন করিতেন। রাজনীতি তাই তাঁহার নিকট ধর্ম্মেরই অন্তর্গত মনে হইত, জাতীয়তাকেও তিনি ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন নাই, আর সাহিত্যকেও ফেরঙ্গভাব বর্জ্জিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপ্রাণতা দেশবন্ধুর পরিবারের বিশেষত্ব। তাঁহার পিতামহ নারায়ণসেবার পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। নারায়ণশিলা আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহার পিতা ভুবনমোহন নির্ভীকভাবে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন। দেশবন্ধুও নারায়ণের চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সহোদরা অমলাদেবী বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সহোদর কবি প্রফুল্লরঞ্জনের মধ্যে বৈষ্ণবের অনেকগুণ দৃষ্ট হয়। আর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণাদেবীও সুলেখিকা, কবি এবং প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-বিশেষজ্ঞা। ব্রজমাধুরী সঙ্ঘের তিনিই প্রতিষ্ঠাত্রী ও অধিনায়িকা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মবিদ্বেষ বা ভেদবুদ্ধি ছিলনা। তাঁহার নিকট শ্রীরাধাই ছিল মহাশক্তি মা, আর শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন মহাদেব স্বয়ম্ভু। শক্তি, প্রেম ও বৈরাগ্যের সমাধানই হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনে।

বুদ্ধদেব যেমন সমগ্র মানবকুলের মুক্তির জন্য সাধনা করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জনও ভারতের ঐহিক মুক্তির জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। যদি মাতৃশৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইতেন, সহস্র লোক লইয়া প্রেমানন্দ বিতরণ করিতেন, প্রতিগৃহে সেই

নাম' প্রতিধ্বনিত হইত, আর সকলে সেই প্রেমসাগরে পাইতেন শুধু আনন্দ, শুধু প্রেম, সর্ব্বজন প্রীতি। বস্তুতঃই চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব ও কর্ম্মপ্রবাহে তাঁহার পিতৃগণ আনন্দ করিতেছেন, দেশ ধন্য হইয়াছে, জাতি উন্নতির শিখরে আরূঢ় হইয়াছে, দেবগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, বসুন্ধরা ধন্য এবং তাহার মাতাও যথার্থ পুত্রবতী—

জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাম্
যেষাম কুলে বৈষ্ণব নামধেয় ॥

বাঙ্গলার দেশবন্ধু ভবিষ্যৎ বাঙ্গলার তথা ভারতের যে অবস্থা কল্পনা করিয়াছিলেন, সে কল্পনা সার্থক করিতে আবার তিনি দেহ ধারণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। আসিবেন না কি— আমরা যে তাঁহারই পথ পানে চাহিয়া আছি—

কবে—অমৃত বৃষ্টি করিবে সৃষ্টি
তোমার চিতার যজ্ঞ ধূম
চেয়ে আছি সবে তব আগমন-পথ
তৃষিত তাপিত দীন বঙ্গভূমি

পঞ্চম অধ্যায়

সাংবাদিক চিত্তরঞ্জন

(১) নারায়ণ

'নারায়ণ' পত্র সম্পাদনা করিয়া চিত্তরঞ্জন জাতির যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহা বিবৃত করিয়াছি। নারায়ণ ছিল মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকায় তিনি নিজেও লিখিতেন এবং নারায়ণের ভাবে ভাবুক এবং ভাল ভাল লেখককে লিখিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি সে সময়ে প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করিতেন, আর লেখকদিগকেও বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিতেন। যে কাগজে নারায়ণের মুদ্রাঙ্কণ হইত, তাহা ছিল খুব মোটা স্থায়ী রকমের কাগজ। সাধারণতঃ ছবির সহায়তায় পাঠকের মনোরঞ্জন করা হইত না। কাগজ সম্পাদনা চিত্তরঞ্জন নিজে করিতেন, আর খরচ নির্ব্বাহও তাহার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত। কে কোন্ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে লিখিতেন, তাহাও তিনি ফরমাস্ করিতেন।

প্রথম বৎসর তিনি প্রার্থনা, নিবেদন, কবিতা, অন্তর্য্যামী ও ডালিম রচনা করিয়া বাহির করেন। কবিতাটিতে সমস্ত হৃদয়ের মর্ম্ম উদঘাটিত হইয়াছে। সহজবোধ্য কবিতাটিতে 'সোণার মন্দির' ভাঙ্গিবার কথাও আছে, আবার ভগবানের প্রতি সম্পুর্ণ নির্ভরতার কথাও আছে—

"হে মোর বিজয়ী রাজা! এস তবে আজ
সমর উল্লাস ভরা বিজয় হুঙ্কারে
দর্পভরে সগৌরবে! ওগো রাজ রাজ
এস আজ রুদ্ধ এই অন্তর দুয়ারে!

ছিন্ন কর বন্ধ মোর কৃপাণে তোমার
চূর্ণ করে দাও মোর সোণার মন্দির!
ধূলিসাৎ হ'য়ে যাক্ পরাণ আধার
বিজয় দুন্দুভি তব বাজুক গম্ভীর
আমি অশ্রুজল চ'খে পরাইব আজ
জয়-মাল্য তব কণ্ঠে, ওগো রাজ রাজ।

'নারায়ণ'ই চিত্তরঞ্জনের রাজ-রাজ। যে মাসে (১৩২১ অগ্রহায়ণ) কাগজখানি বাহির হয়, প্রথম পাতারই তিনি একটি স্তবে যে আত্ম-নিবেদন করেন, তাহাতেই প্রতি বিষয়ে তাঁহার অন্তর্প্রদেশ উদ্ঘাটিত হয়। পাঠকের অবগতির জন্য চিত্তরঞ্জন-রচিত সেই সমগ্র স্তবটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম:

'নারায়ণ উদ্বোধনে'—নারায়ণ স্তব

নমস্তে নারায়ণ!

তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায় একমাত্র অবলম্বন। আমাদের এই হাসি আনন্দময় জীবন, সুখে-দুঃখে পরিপূর্ণ সংসার,—ইহাকে বাঁচাইয়া, জাগাইয়া রাখ একমাত্র তুমি।

তুমি ভিন্ন সকল সৃষ্টি মিথ্যা, সকল জীব মায়া-পুত্তলিকা। তুমি যখন আপনাকে লুকাইয়া রাখ তখনই সংসার মায়ার খেলা হইয়া উঠে। তুমি সৃষ্টিকে সত্য করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছ। সকল সংসার তোমার লীলাভূমি।

নায়ক-নায়িকার মাধুর্য্য, পিতামাতার বাৎসল্য, সখার সখ্য এবং প্রভু ও দাসের একদিকে স্নেহ ও অপরদিকে ভক্তি—এইসব লইয়াই ত সংসার, এইসব লইয়াই ত জীবের জীবন। তুমিই ত এই সকল রসকে—সার্থক কর। সকল রসের একমাত্র লক্ষ্য তুমি; আর যাহাকিছু সব ত উপলক্ষ্য।

ওই যে মাতা বাৎসল্য-আবেগে আপনার শিশুটিকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেছেন, ঐ বাৎসল্যরস ত তোমারই দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ওই শিশুর মধ্যে যে জননী শিশুরূপী তোমাকে না দেখিতে পান, তাঁহার বাৎসল্যের সার্থকতা কোথায়? তুমি যখনই তাঁহার ওই শিশুরূপে আবির্ভূত হও, তখনই তাঁহার বাৎসল্য ধন্য হয়। বাৎসল্যের অসীম আনন্দ তিনি তখনই উপভোগ করেন। নায়ক-নায়িকার যে মাধুর্য্য রস তাহাও তোমারই পানে প্রবাহিত হয়; যতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া না পায় ততক্ষণ তাহার কোনও সার্থকতা হয় না। যখনই তুমি নায়ক নায়িকারূপে আপনাকে প্রকাশিত কর, তখনই তাহাদের প্রেমালিঙ্গন ধন্য হয়। তাহারা হাসি—অশ্রুজলে, চুম্বনে, পরশে তোমারই মাধুর্য্যরসের অপার আনন্দ সম্ভোগ করে; সকল সখ্যের তুমি আশ্রয়, সকল দাস্যের তুমি যে প্রভু। যতক্ষণ তুমি সখারূপে, প্রভুরূপে, না দেখা দাও, ততক্ষণ, তাহারা কই সখা, কই প্রভু বলিয়া এই সংসার অরণ্যে কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তুমিই তাহাদের সখ্য ও দাস্যকে সার্থক করিয়া তুল।

সকল জীবের তুমি একমাত্র আশ্রয়, সকল নরের তুমি সমষ্টি, সকল নরসমাজের তুমি ব্যষ্টি, সকল জাতির তুমি জাতীশ্বর। তুমিই বিশ্বমানব;—অতীত মানব তোমারই বুকে লুকাইয়া আছে, বর্ত্তমান মানব তোমারই জীবন আশ্রয় করিয়া জীবনযাপন করিতেছে; আর মানব যাহা হইবে, তাহার সমুদয় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও এক অপূর্ব্ব অসংখ্যদল পদ্মের মত তোমারই বক্ষে ফুটিয়া আছে। তুমি দেহ, তুমিই আত্মা, তুমি সাধনা, তুমিই সিদ্ধি, অনাদি তুমি আদি তুমি, অনন্ত তুমি, সান্ত তুমি। তুমিই নরনারায়ণ!

তুমি যেমন জীবের অবলম্বন, জীবও যে তেমনি তোমার অবলম্বন। প্রভো! জীব ছাড়াও তোমার চলে না। লীলা-প্রয়োজন বৈকুণ্ঠেও

তুমি জীবকে তোমার বক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দিলে। সে জীব ছাড়া তোমার লীলা সম্ভব হয় না। তুমি নিত্যই এক, আর নিত্যই দুই হইয়া আপনার মধ্যে লীলা কর, তুমি এক হইয়াও লীলারসে বিভোর হইয়া অনন্তরূপ ধরিয়া বিশ্বসংসারে বিচরণ কর। তুমি যখনই তোমার বিশ্ববীণায় ঝঙ্কার দেও তখনই সকল বিশ্বের কবি গান গাহিয়া উঠে। কার সে সঙ্গীত প্রভো! তুমি ছাড়া কেই তাহা সম্ভোগ করে। তুমি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া স্নেহ দান কর—আবার তুমিই সন্তান হইয়া সে স্নেহ দাবী কর! তুমি প্রভু হইয়া দাসকে স্নেহে আবদ্ধ কর, আবার তুমিই দাস হইয়া প্রভুকে প্রাণের ভক্তি অর্পণ কর। তুমি সখা হইয়া সখ্যরস ঢালিয়া দাও, আবার তুমিই সে রস সম্ভোগ কর। তুমি ধনী হইয়া দান কর, ভিখারী হইয়া গ্রহণ কর। তুমিই নায়ক-নায়িকা হইয়া প্রেম লীলার অভিনয় কর। তুমিই তাহাদের বাহুপাশ হইতে আলিঙ্গন কাড়িয়া লও, তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে চুম্বন চুরি করিয়া আস্বাদ কর।

সকল ভোগ্যের তুমি ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদকারী। আমাদের সকল কর্ম্মের তুমিই কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমি ধাতা, সকল বিধির তুমি বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা, হে অনন্তরূপী নারায়ণ! তোমার কথা যখনই ভাবি, অতীতে সমস্ত যবনিকা উত্তোলিত হয়, তখন বুঝিতে পারি ইতিহাস শুধু তোমারই লীলাপূর্ণ পুণ্য কাহিনী। সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর জীব। তুমি এক, তুমিই দুই—এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। ইহাতেই বিশ্বের নিখিল রস-স্ফূর্ত্তি। ধন্য জীব, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লীলা।

নমস্তে নারায়ণ!

আর নিম্নলিখিত কবিতাটিতে চিত্তরঞ্জন অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করিয়া বলেন—

"যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই
মনে রেখো আমি শুধু তোমারেই চাই।
প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে
তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে
সে দিন হইতে বঁধু আলোকে আঁধারে
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে
বঁধুহে! বঁধুহে! আমি তোমারেই চাই,
যে পথেই লয়ে যাও, যে পথেই যাই!

এইরূপ স্তব, গান ব্যতীত 'নারায়ণ' উপলক্ষ্য করিয়া মাতৃ-ভাষার সাধকগণ উচ্চ স্তরের প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতেন। লেখকগণও ছিলেন বঙ্গভাষা সাহিত্যের সকলেই ধুরন্ধর। সকলেরই রচনাই ছিল প্রথম শ্রেণীর—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সাহিত্য রথী বিপিনচন্দ্র পাল, সুলেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যাচার্য্য জলধর সেন প্রভৃতি।

চিত্তরঞ্জনের বড়ই ইচ্ছা ছিল বৃন্দাবন সম্বন্ধে একটি কাহিনী থাকে। বিল্বমঙ্গল নাটকের গানগুলি তাহার বড় ভাল লাগিত। তিনি বলিতেন সে গানটি কি সুন্দর—

"আমি বৃন্দাবনের বনে বনে ধেনু চরাব
খেলব কত ছুটোছুটি বাঁশী বাজাব"।

তাই তিনি জলধরবাবুকে একটী ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করেন। জলধরবাবু হিমালয়, প্রবাস-চিত্র, পথিক লিখিয়া পাঠকের

অন্তস্পর্শ করিতে পারিয়াছেন। তাই তাঁহার উপরই ভার পড়িল।

জলধরবাবু বলিলেন—বড় মুস্কিলে ফেলিলেন, ভ্রমণতো করি নাই, বৃত্তান্ত আসিবে কোথা হইতে?

চিত্তরঞ্জন—কেন, আপনি কি কখনও বৃন্দাবনে যান নাই? জানেন তো রাখাল বালকের কথা—'যাক্ বৃন্দাবনে যাক্—বৃন্দাবনে গেলে কৃষ্ণকে পাবে'

জলধরবাবু—বলিলেন "হাঁ অনেকবার গিয়েছি!

চিত্ত—তবে তাহারই একবারের কথা লিখিয়া দিতে হইবে। জলধরবাবু মৌন হইলেন, চিত্তরঞ্জন তাহাই সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপরে জলধরবাবুর প্রবন্ধটি পড়িয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিলেন—প্রথমেই রহিয়াছে কি অন্তস্পর্শ কথা! জলধরবাবু লিখিয়াছেন "যে বৃন্দাবনের ক্রোড় বাহিনী যমুনার কথা মনে হইলেই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে—

"যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী
ও যার বিমলতটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি।"

সে যমুনার কথা আমি কেমন করিয়া বলিব? বৈষ্ণব কবিগণ যে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া লেখনী ত্যাগ করিয়াছিলেন সে বৃন্দাবনের কথা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব"।

তারপরে জলধরবাবু যে লিখিয়াছেন "ঐত সম্মুখে বৃন্দাবন, কিন্তু সে ধবলী শ্যামলী কৈ? সে গোপনারীবৃন্দ কৈ? সে শ্যামের মধুর মুরলী ধ্বনি কৈ? যে বাঁশীর স্বরে যমুনা উজান বহিত, সে বাঁশীর স্বর কৈ?" ইত্যাদি কথায় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কবিতাটিই মনে হয়—

"এই কি সেই মধু বৃন্দাবন?
কই তবে ভ্রমর গুঞ্জন?
কই সেই মুরলীর ধ্বনি—
তান তরঙ্গিনী উন্মাদিনী কই ধায়?
কই পীতাম্বর মুরলী অধর
বামে রাধা বিনোদিনী?
কই, কই? কি হ'ল আমার?
বৃন্দাবনে কই সে মাধব?"

চিত্তরঞ্জন ভারী প্রীত হইলেন, প্রথম মাসেই এই সুলিখিত "বৃন্দাবন" প্রবন্ধটি নারায়ণের কলেবর সুশোভিত করিল।

"পৌরাণিকী কথা" প্রবন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও নারায়ণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"যুগে যুগে তুমি কত রূপ ধারণ করিয়াছ। কত ভাবের প্রচার করিয়াছ, আজ নারায়ণের অঙ্গীভূত হইয়া বাঙ্গলার তথা ভারতভূমির নর-নারায়ণের পুষ্টিকল্পে অবতীর্ণ হও, আমাদের নরদেহ ধারণ সার্থক হোক্ প্রভু!"

অন্যান্য প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎমাত্র পরিচয় দিতেছি—

বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় 'নূতনে পুরাতনে" এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন 'আজ আমরা আমাদের স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনাকে অল্পে অল্পে প্রত্যক্ষভাবে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছি। হিন্দুর সভ্যতা ও সাধনা বহুকাল পূর্ব্বে যে পরিণতি পাইয়াছিল, তাহাই এতাবৎকাল চলিয়া আসিয়াছে, তার অপচয় বা সঙ্কর আর কিছুই হয় নাই—এ কথা যে বলে, সে হিন্দুর ইতিহাস জানে না, হিন্দুর শাস্ত্র বুঝে না, হিন্দুর দর্শনের ক, খ, এর জ্ঞান পর্য্যন্ত তার জন্মায় নাই। হিন্দু চিরদিনই মুক্তভাবে চলিতে শিখিয়াছে। এই মুক্তির জন্য সে নিজকে

কতবার বাঁধনে জড়াইয়াছে। আবার এই বন্ধনের দ্বারা এই মুক্তি-লাভ হইল না দেখিয়া নির্ম্মমভাবে সকল বিধি-নিষেধকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে। এই কথাটা বুঝিলেই হিন্দু যে কোনও দিন অচলায়তন রচনা করিয়া তাঁর ভিতরে বেশীদিন আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, এটা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। যুগে যুগে হিন্দু যুগ প্রয়োজনকে অঙ্গীকার করিয়া নূতন নূতন ধর্ম্মের, নূতন নূতন কর্ম্মের, নূতন নূতন বিধিনিষেধের, নূতন নূতন শাস্ত্র সংহিতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যথাপূর্ব্বং তথাপরং। যুগে যুগে যাহা হইয়া আসিয়াছে, এই যুগে কি কেবল তার ব্যতিক্রম হইবে?

"ব্যতিক্রম যে হয় নাই, পরমহংস রামকৃষ্ণ, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ,—ইঁহারাই তার সাক্ষী।"

"বৌদ্ধধর্ম্ম" প্রবন্ধে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি," প্রভৃতি বুঝাইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সারতত্ত্ব পরিবেশন করেন। "হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব" প্রবন্ধে আচার্য্য ব্রজেন্দ্র চন্দ্র শীল মহাশয় দেখাইয়াছেন কিরূপে বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া হিন্দুর তত্ত্বান্বেষণ ও তত্ত্বপিপাসা চিরদিনই অনন্তের প্রতি একটা গভীর অনুরাগের প্রেরণা অনুভব করিয়াছে, এই প্রেরণায়ই হিন্দু বলিয়াছে "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি", অর্থাৎ যাহা ভূমা তাহাতেই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই।

শ্রীসরযূবালা দাশগুপ্তার "আমার শিল্প" প্রবন্ধটিও গভীর ভাবাত্মক। 'নারায়ণে' তাহার আরও কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হয়।

"মৃণালের কথায়" বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় ইব্‌সেনিজমের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি রবীন্দ্র নাথ 'সবুজ পত্রে' 'মেজদিদি' প্রবন্ধে মেজদিদি মৃণালকে বাহিরের আলো দেখিবার জন্য ঘরের বাহির করিয়াছিলেন। 'নারায়ণে' প্রকাশিত 'মৃণালের কথায়'

বিপিন বাবু রসালভাবে তাহার উত্তর দিয়াছেন। এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জনের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার মত্‌ও জ্ঞাত হইয়াছি। তিনি বলিতেন "স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়, তর্ক হয়, অমিল হয়, কিন্তু আমাদের দেশে তাহা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। কিন্তু Dolls House-এর নোরার মত দেশের মেয়েগুলিও যদি বাহিরে যেতে আরম্ভ করে তবে ভারতবর্ষের সমাজ বন্ধন টিক্‌বে কি করে? সমস্ত সমাজটাই তা'হলে Dolls House এ পরিণত হবে।"

পৌষমাসেও এইরূপ উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধই বাহির হয়। চিত্তরঞ্জনের অন্তর্য্যামী ব্যতীতও, শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধধর্ম্ম, বিপিনবাবুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও ভাষার কথা, রমেশ মজুমদার মহাশয়ের শক ও শকাব্দা, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের "বাঙ্গলা নাট্য সাহিত্যের পূর্ব্ব কথা" প্রভৃতি বাহির হয়। মহিলাকবি গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর 'বিশ্ব দর্পণে' কবিতাটিও বেশ ভাবাত্মক। এই মাসেই চিত্তরঞ্জনের 'ডালিম' গল্পটি বাহির হয়।

মাঘমাস হইতেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সুরেশ সমাজ-পতি মহাশয়ের 'সেকালের স্মৃতি' বাহির হয়। কবি কালিদাস রায়ের চিরকিশোর হৃদয়গ্রাহী কবিতা—

"আজো তুমি বাজাইছ সুমোহন বেণু
অনন্তের বারতা সে আনে,
বিশ্বভরা তব দোল-ঝুলন হেরিয়া
নাচিবারে সাধ যায় প্রাণে।"—

ফাল্গুন মাস হইতেই বৈষ্ণব কবি সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের প্রথম সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ "কবিতার কথা" বাহির হয়। শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবীর গল্প "দুঃখী দাদা" বাহির হয়। কবিতার কথায় চতুর্দ্দিকে প্রশংসা ছড়াইয়া পড়ে। ফাল্গুন মাস হইতে চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতৃজায়া বিমলা দেবী, জগদম্বা-দেবী নাম দিয়া "আমার কথা" প্রবন্ধটি ধারাবাহিকরূপে বাহির করেন।

প্রবন্ধটি গভীর তত্ত্বমূলক। চৈত্র মাসের প্রবন্ধটি খুবই উচ্চাঙ্গের। জলধর বাবু আবার 'বৃন্দাবন' লেখেন ও কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের "মহিলা কাব্য" খানির সমালোচনা করেন সুকুমার রঞ্জন দাশ। মেঘনাদ বধ কাব্যে সীতা ও সরমার সমালোচনা করেন দীননাথ সান্যাল।

বঙ্কিমসংখ্যা।

'নারায়ণ' বাহির করিবার অল্পদিন মধ্যেই চিত্তরঞ্জন স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যাহাতে বিশেষভাবে আলোচনা হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসের নারায়ণ "বঙ্কিম সংখ্যা" রূপে বাহির হয়। প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠায় নানাবিধ তথ্যপূর্ণ মৌলিক ও উপাদেয় প্রবন্ধে নারায়ণের ডালি সজ্জিত হয়। প্রবন্ধগুলির একটু আভাস দিতেছি—

বঙ্কিম কাঁটাল পাড়ায়—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
অর্জ্জুনা পুষ্করিণী—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিম-কনিষ্ঠ)
বঙ্কিমের প্রস্ত্রী—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
সেকালের স্মৃতি—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
'রজনী' সমালোচনা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল *
বঙ্কিম বাবু—ললিত চন্দ্র মিত্র (দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র)
ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্কিম মণ্ডল বা বঙ্গদর্শন—বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র
(দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র)
বঙ্কিমবাবু ও উত্তর চরিত—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

---

* জ্ঞানাঞ্জন পাল নামে বাহির হয় বটে, কিন্তু আমরা জানি উহা বিপিন বাবু রচিত।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—"গীতার কথা" শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

বঙ্কিম স্মৃতি—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার দ্বারবান পাঠক, জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চরিত্র চিত্র—বিপিনচন্দ্র পাল, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক প্রেরিত।

এতদ্ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় শ্রাবণের সংখ্যায় বঙ্কিমবাবুর "পিতৃপ্রসঙ্গ" বাহির করেন, এবং এতদসম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও ভাদ্র মাসে আবার কিছু কিছু বক্তব্য বাহির করেন। উক্ত বঙ্কিম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ছবি, বাড়ীর বিভিন্ন স্থানের ছবি এবং অর্জ্জুনা পুষ্করিণীর, বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা, রাধাবল্লভের রথ, গুঞ্জবাড়ী, আটচালা বা নাচঘর প্রভৃতি চিত্রমালা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপিও প্রকাশিত হয়, ছবিও বাহির হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রকাশিত উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি সবই উপাদেয় ও তথ্যমূলক। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায়ই যে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "সিরাজদ্দৌলা" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আর বঙ্কিমবাবুর প্রিয়শিষ্য ও সুহৃদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "আর্য্যাধিকারের পূর্ব্বে বঙ্গের অবস্থা" লিখিয়াছেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই, একটা বড় তামাসা হইয়াছিল" কথায় মৈত্রেয় মহাশয় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, আর "বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই, নইলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবেনা" কথায় রাখালবাবু ও শাস্ত্রী মহাশয় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণার ফলেই যে রাখালবাবু "বাঙ্গলার ইতিহাস" লিখিয়াছেন, একথাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় ইহার পরেও বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে আরও দুই একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ ও গান

আষাঢ় মাসের কাগজে (১৩২২) আবার চিত্তরঞ্জনের একটী সুন্দর গীত প্রকাশিত হয়। গানটির প্রথম কয়েক ছত্র এইরূপ—

কেন ডাকো এমন করে
ওগো আমার প্রাণের হরি
কেমন করে যাবো বল,
ডাক শুনে যে কেঁদে মরি !

এই মাসে আবার তাহার রচিত একটী কীর্ত্তনও প্রকাশিত হয়—

ওগো আমার উজল বরণ
কেন লুকাও মেঘের মাঝে ?
ওই যে তুমি কাছেই আছ
ওই যে তব নূপুর বাজে !

এই মাসেই 'মহিলা' কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের তথ্যপূর্ণ সমালোচনা করেন সুকুমাররঞ্জন দাশ।

দ্বিতীয় বর্ষ আবার যখন আরম্ভ হয় (১৩২২ অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধগুলি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই 'নারায়ণের' প্রতিষ্ঠা রক্ষা করে—

১। কিশোর কিশোরী (কবিতা)—চিত্তরঞ্জন দাশ
২। ধর্ম্ম ও আর্ট—বিপিনচন্দ্র পাল
৩। রাধামাধবোদয়—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫। নববর্ষ—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। কিশোরী—দেবেন্দ্রনাথ সেন
৭। বহু বিবাহ (গল্প)
৮। নাটুকে রামনারায়ণ—অশ্বিনীকুমার সেন
৯। মায়াবতী পথে—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১০। প্রাণপ্রতিষ্ঠা (গল্প)—চিত্তরঞ্জন দাশ

১১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্তব—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

সম্পাদক প্রথমেই লেখেন :

"নববর্ষে নবীনের কথাই মনে পড়ে। তাই কৃষ্ণ কথা মনে আসিয়া উঠে। তিনি ত পুরাতন হইবেন না—হইবার নহেন। কারণ তিনি যে আমার, আমাদের দেশের, জাতির, ধর্ম্মের, সাহিত্যের, কাব্যের অলঙ্কারের, প্রেমের এবং রসের। যে পদ্ধতিতে পূর্ব্ববর্ত্তীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাজাইয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে এখন পুরাতন বোধ হয়। এখন রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে নূতন পদ্ধতিতে আমার নটবরকে সাজাইতে হইবে। "নারায়ণ" পুরাতনকে—সনাতনকে নূতন করিয়া দেখিবার একটা রকম-ফের মাত্র।"

চিত্তরঞ্জনের নিজের কবিতা, গান ও কীর্ত্তন সবই ছিল ভগবদ্ছন্দে রচিত। এতদ্ব্যতীত গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দ দাস, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, মানকুমারী বসু প্রভৃতির কবিতা মাঝে মাঝে বাহির হইত।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বৃন্দাবনের বাঁশীর মুখে আরোপ করিয়াছেন—

সেই আমি সেই আমি
আর নহে কেহ
রাধা রাধা রাধা রাধা
আধা মোর দেহ।

'আহ্বানে' বলিতেছেন—

এসো এসো বঁধু বলি ডাকিছে তরঙ্গ তুলি
রাধার সর্ব্বাঙ্গ মন হৃদয় পরাণ
এস এস এস পিয়া! ডাকিছে তোমার প্রিয়া
সুরভি মাখিয়া ডাকে নিভৃত শয়ান।

মানকুমারী বসুও 'নারায়ণ' নামধেয় একটি কবিতায় নারায়ণ চরণে যাইতে চাহিতেছেন—

"আমিও অন্তিমে চাহি দেব নারায়ণ
আমারে দেবে না কেন ও রাঙ্গাচরণ ॥"

সকলের কবিতাই চিত্তরঞ্জন পছন্দ করিয়া দিতেন। ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর অনুরাগিনী কবিতাটি বেশ ভাল লাগিত—

কি তোর পিরীতি রাই
তুহার পিরীতি স্মরণ করিতে
আপনা হারায়ে যাই !
নাহিক কামনা, নাহিক বাসনা
আপনা বলিতে নাই,
তুহুঁ যে বঁধুর, চরণ নূপুর
চলনে বাজিছ তাই
বঁধুর কারণ জীবন ধারণ
বঁধুর বিরহে তাই
নয়ন মুদিয়া রহগো ডুবিয়া
মরম ভিতরে যাই

চিত্তরঞ্জনেরও স্বরচিত গানগুলিও বড় সুন্দর হইত। পৌষ মাসে (১৩২২) একটী গান প্রকাশিত হয়,—সেটি পাহাড়ী একতালা :

"আজিকে বঁধু থেকোনা দূরে
গেয়োনা অমন করুণ সুরে।
ঝড়ের মাঝে বাদলা হাওয়ায়
ঝড় উঠেছে পরাণ পুরে।
আজিকে তোমার সোহাগ ভরে
সকল দেহ উথ্‌লে পড়ে

আজিকে তোমার পরশ লাগি
ঝর ঝর ঝর নয়ন ঝরে।
আজিকে ঘোর বিরহ বাহি
উঠেছে ঝড় পরাণ পূরে।

স্বরলিপি সংযোজনা করেন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্য সমালোচনাও হইত। কবি জীবেন্দ্র দত্ত নবীনচন্দ্রের শৈলজা চরিত্রের সমালোচনা করেন। সুকুমাররঞ্জন দাশ মহিলা কাব্য প্রণেতা সুরেন্দ্র মজুমদারের কবিতার সমালোচনা করেন। জয়নারায়ণ প্রতিভা সমালোচনা করেন, আনন্দনাথ রায় মহাশয়, মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার আলোচনা করেন নলিনী ভট্টশালী। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং বিপিন পাল মহাশয়েরও বহু প্রবন্ধ রহিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধতত্ত্ব ব্যতীত বঙ্কিমবাবু ও উত্তর চরিত, কালিদাসের মেয়ে দেখান, দুর্গোৎসবে, নবপত্রিকা, সীতার স্বপ্ন প্রভৃতি প্রবন্ধ বাহির হয়। বিপিন পাল মহাশয়ের শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, মৃণালের কথা, হিন্দুশ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের দেব-বাদ, রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্বচিত গৌরচন্দ্র অবতার কথা, সকলি আছে কিছুই নাই, মাতৃপূজা, জাতীয় বর্ণভেদের কথা প্রভৃতি বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মাইকেল মধুসূদন ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ প্রবন্ধ এখানে প্রকাশিত হয়।

নলিনীকান্ত গুপ্তের আর্য্যের আধ্যাত্মিকতা, কাব্য ও তত্ত্ব, সাধু ও শিল্প, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলিত ভাষা ও সাধুভাষা, সেকালের নবদ্বীপ, সেকালের বসন ভূষণ, প্রফুল্ল সরকারের জাতীয় জীবনে বাংলের লক্ষণ, নবদ্বীপে মাতৃমন্দির, ভাবার কথা, নবগোপাল মজুমদারের

রঙ্গলালের বিরহ বিলাপ। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে (রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্মৃতি), মগধের মৌখরি রাজবংশ—চারুচন্দ্র বসুর "অশোকের ধর্ম্মলিপি", শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ, প্রফুল্লচন্দ্র বসুর ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র বা হিষ্টির বেঙ্গল গেজেট, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মায়াবতীর পথে কয়েক মাস ধরিয়া বাহির হয়। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের 'ভ্রমণের কথা'ও বাহির হয়।

নারায়ণে প্রথমে যেমন শ্রীযুক্ত বিপিন পাল দেশবন্ধুকে সর্ব্বতো-ভাবে সহায়তা করিতেন, দুই এক বৎসর পরে শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী ও তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সহকারিতা করেন। তিনি অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধও লেখেন—স্বামী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে অনধিকারী, কবি গোবিন্দ দাস, স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্র লালের বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব, ভাওয়ালের কবি—

গিরিজা বাবুর 'মডেল নায়িকা' ও 'দোসরা নম্বর'ও বড় রহস্যপূর্ণ প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে প্রকাশিত 'পহেলা নম্বর' গল্পটিতেও নায়িকাকেও বাহিরের আলোক দেখাইতে চাহিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তর হয় দোসরা নম্বরে। গিরিজাবাবু মডেল নায়িকারূপে আলোচনা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমী ও শরৎচন্দ্রের কিরণময়ীকে (চরিত্রহীন)—

নারায়ণে সুন্দর সুন্দর গল্পও বাহির হইত। দেশবন্ধুর ডালিম ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর একটি গল্পও লিখিয়া-ছিলেন। সেটি কোনটি ঠিক ধরিতে না পারায় আলোচনায় বিরত রহিলাম।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'স্বামী' বাহির হয় ১৩২৪ শ্রাবণ ও ভাদ্রে। ইহার পর হইতেই শরৎবাবুর সঙ্গে আলাপ

পরিচয় হয়। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বেণের মেয়ে'ও বাহির হয়—সরোজনাথ ঘোষের কাহার দোষ, কৃতজ্ঞতা, কেরাণী, মাতৃস্মৃতি প্রভৃতি গল্পও বাহির হয়। 'বহু বিবাহ' গল্পটি বেশ উপাদেয়।

দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তকে একাঙ্কিকা নাটিকা লিখিতে অনুরোধ করেন। অতঃপরে তাহার জীবনপণে, মরণে জয়, আঁধার ঘরে, কমলের দুঃখ, নিয়তির খেলা প্রভৃতি গল্প বাহির হয়। গল্পগুলি সম্বন্ধে স্থানে স্থানে বিশেষ বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়। স্থান বিশেষে ত্রুটি বিচ্যুতি ছিলনা তা নয়। গল্পগুলিতে নানা অবস্থায় পড়িয়া নানাভাবে পড়িয়া সমাজের মেয়ে কিরূপে দুশ্চরিত্রার পরিণত হইয়া পড়িত, এবং তাহাদের চরিত্রেরও কিরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত, তাহাই দেখানো হইয়াছে। কোন কোন স্থান খারাপ হইলেও, আবার কেহ কেহ না পড়িয়াও সমালোচনা করিত। তবে বেশী আক্রান্ত হইত বলিয়াই উক্ত লেখকের সাধ্যমত সমর্থন করিতেন দেশবন্ধু, কারণ 'যার কেউ নাই দেশবন্ধু তার' এরূপই সর্ব্বত্র দেখা গিয়াছে। 'কমলের দুঃখে' আছে যে জেনা আর্শিতে নিজের রূপের ছবি দেখিতেছে, আর টিয়ে পাখী মুখে মুখ লাগাইয়া......

একজন ভদ্রলোক বলিলেন—গল্পটির বড় নিন্দা হচ্ছে! বড় Suggestive of indecency.

দেশবন্ধু—কেন?

সমালোচক—ইহাতে Kiss এর ভাব আসে। বাঙ্গালী মেয়েদের কাছে বড় অশ্লীল!

চিত্তরঞ্জন—কেন বাঙ্গালীর মেয়েরা কি Kiss কাকে বলে জানে না? তবে তো সত্যেন একটা নূতন শিক্ষা দিলে। কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন! তবে তো খাটের পায়া দেখলেই কাহারও মনে কুভাব জাগ্‌তে পারে।

অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত লিখিয়াছেন :—

"অধুনা শরৎবাবুর উপন্যাসে পতিতাদিগের প্রতি সহানুভূতি লক্ষিত হয়। কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে এইভাবে সাড়া বড় পাওয়া যাইত না। জানিনা, এই কারণেই তিনি ঠিক সেই সময়ে তাঁহার 'নারায়ণে' বারাঙ্গনা চরিত অঙ্কিত করিতেছিলেন কিনা। এজন্য তাহাকে নিন্দা ভোগও করিতে হইয়াছিল। আমরাও এ সম্বন্ধে বেশী খোলাখুলিভাবে তাহার সঙ্গে আলোচনা করিতে একটু শঙ্কিত হইতাম। তবে ব্যক্তি বিশেষকে কেবল ঐ একই বিষয়ে গল্প লিখিতে কেন প্রশ্রয় দিতেছিলেন এই কথা আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে ঐ লোকটির খুব প্রতিভা আছে, যদি এই একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া তার প্রতিভা বিকসিত হইবার সুযোগ পায় তাহা হইলে একটু প্রশ্রয় দেওয়ায় দোষ কি ?

চৈত্রে (১৩২৩) দেশবন্ধু-দুহিতা অর্পণাদেবীর 'বিমাতা' গল্প এবং সরলাবালা দাসীর "মায়ের সাধ" কবিতাটিও বেশ সুন্দর ছিল—

"গোপাল আমার, মায়ের নয়নে
আবার সে রূপ ধর
কালিন্দীর কাল বিষজল মাঝে
কালীয় দমন কর।

এই মাসে চিত্তরঞ্জনের "রূপান্তরের কথা" প্রবন্ধও বাহির হয়—ইহা সরস্বতী ইনষ্টিটিউটের অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন।

১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ—চিত্তরঞ্জনের বাঙ্গলার গীতি-কবিতা ও স্যার শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুর নিবেদন বাহির হয়। নববর্ষে "ধর্ম্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ" একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহারই উত্তর রবীন্দ্রনাথ দেন সবুজপত্রে "আমার ধর্ম্ম" প্রবন্ধ নামে। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণির

—"হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও সংযম এবং পূজ্যপাদ কবি স্যার রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধও উপাদেয়।

মাঘ—১৩২৪

একখানি পত্র—

(শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ও বৈষ্ণব কবিতার কথা)

বিপিনবাবু প্রবন্ধান্তরে ইহার প্রকৃষ্ট উত্তর দেন—

১৩২৫ বৈশাখে চিত্তরঞ্জনের 'স্বাগতম' বাহির হয়।

১৩২৫ বৈশাখে কবি গোবিন্দ দাসের একটি কবিতা বাহির হয়—

মহারুদ্র! শূলদণ্ডে কর বিদারণ—
টুটে যাক্ তন্দ্রাঘোর, সে আলোকে হোক্ ভোর
সংহারে নূতন সৃষ্টি হোক্ আবাহন
হে লীলা-চঞ্চল সখা, দাও দেখা, দাও দেখা
রাঙা পায়, ধরি পায় এস নারায়ণ!
জীবের শরেণ্য তুমি, দেবের বরেণ্য তুমি
ভক্তের জীবন বাঞ্ছা শ্রীমধুসূদন

'স্বাগতম' প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন—

"আজ সে শ্রীবিক্রমপুরের সে শ্রী নাই, বুকের উপর দিয়া পদ্মা চলিয়া গিয়াছে, সে ভূভাগকে টুকরা করিয়া দিয়াছে। সে স্বপনের দেশ কোথায় গেল? সুখের সে স্মৃতি আছে, আর কিছু নাই।

"আজ পূর্ব্ববঙ্গ শ্মশান—গাঢ়তর অন্ধকার, দিবসে নিশীথ! প্রেতের মত আমরা কয়টি আছি। তবু এই আমাদের ভিটা। তৈল বিনা সন্ধ্যা দীপ জ্বালিতে পারি না, ঘরের চালে খড় দিতে পারিনা, দেউলে দেব-সেবা হয় না! পেটে অন্ন নাই, কটিতে বস্ত্র নাই, জলাশয়েও জল নাই। যে মহাবীর্য্যের কেন্দ্র হইতে গৌড়বঙ্গ একদিন প্রস্থান

পর্য্যন্ত শাসন দণ্ড পরিচালনা করিত, যে কেন্দ্র হইতে একদিন আমার বঙ্গ, জগতের বিলাস যোগাইত, যে কেন্দ্র হইতে গৌড়ীয় রীতি ভারতে চলিয়াছিল, এ-কি সেই ভূমি!

"বুঝি আজিকার দিনের মত বাঙ্গলার ঘরে এমন দুর্দ্দিন কখনও আসে নাই। এত কালের দীর্ঘ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ও এত অন্ধকার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও হা-হুতাশের নিষ্ফল বাণী ফোটে নাই! এমন বিপন্ন আমরা আর কখনও হই নাই। এক রামচন্দ্রের বনবাসে সারা অযোধ্যা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, আজ পূর্ব্ববঙ্গ ভাগ্যহীন, কত শত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বনবাসে দিয়া একহাতে চক্ষু মুছিতেছে, আর অন্য হাতে আপনাদের জন্য পাদ্য ও অর্ঘ্য আনিয়াছে।

আজ শ্রদ্ধার উপহার গ্রহণ করুন, পূর্ব্ববঙ্গ ধন্য হউক কৃতকৃতার্থ হউক—

"দরিদ্র সেবক মোরা আছি জন্ম জন্ম।"

শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী গোবিন্দ দাসের কবিতা আলোচনা করিয়া বলেন "তাহার সাধারণ সুর বিষাদের। তিনি নিজে দুঃখী মানুষ, কবিতাও দুঃখের।

ও ভাই বঙ্গবাসী আমি ম'লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!
আজ যে আমি উপোস্ করি,
না খে'য়ে শুকিয়ে মরি
হাহাকারে দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্।

ভাষার কথা

আর একটি বিষয়ে নারায়ণের অবদান অপরিশোধনীয়। সবুজপত্র যে বীরবলী ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়া বিদেশ হইতে আমদানী ভাবধারা প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পায়, তাহার আভাষ পূর্ব্বে দিয়াছি। কিন্তু

বীরবল যে মারাত্মক ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গলা ভাষার গাম্ভীর্য্য এবং সাবলীলতা নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, নারায়ণ তাহার গভীর প্রতিবাদ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নারায়ণ সহজ ভাষার প্রবর্ত্তন করে,—যে ভাষা বহু আয়াস ও সাধনার পরে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বর্দ্ধিতায়তন "ইন্দিরা" উপন্যাসে করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্তের গুরুগম্ভীর ভাষা ও "আলালের ঘরের দুলালের" চলতি ভাষা আকারে ও ভাবে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও বঙ্কিম বাবুই যাদুমন্ত্রবলে দুই ভাষার মিলন করিয়া দিয়া বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির জন্য অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রও সেই নব-সৃজিত ভাষা ক্রমে ঘষিয়া মাজিয়া আরও বিশুদ্ধ এবং সাবলীল ভাষায় পরিণত করিয়াছেন। নারায়ণ এই 'ইন্দিরার' ভাষার অনুবর্ত্তী হইয়াই বীরবলী ভাষার উত্তর দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

'নারায়ণ' বাহির হইবার পরেই সবুজপত্রে (১৩২১, ফাল্গুন মাসে) প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। উহা ছিল উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ। মিঃ চৌধুরী তাহাতে বলেন "আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, কারণ সে ভাষা সহজ, সরল, সুঠাম এবং সুস্পষ্ট"। ইহার পরেই 'নারায়ণ' ইহার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হয়। আবার তিনি বলেন "শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষাই প্রকৃত সাধু ভাষা।"

এই বিষয়ে 'নারায়ণের' প্রসিদ্ধ লেখক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকদের কথিত ভাষার একটী নমুনা দেন—

"আমি লাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ ক'রতে ক'রতে ষ্টেসনে পৌঁছে বেনারসের জন্য বুক করলাম, ফাষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকেণ্ট ছিল না,

আপার বার্থে বেডটা স্প্রেড ক'রে একটু সর্ট ন্যাপ নেবার চেষ্টা করছি এমন সময়ে হুইসিল দিয়ে ট্রেণ ষ্টার্ট কল্লে”—

এই ছিল তখনকার ইংরাজী-নবিস শিক্ষিত নামধেয় বাঙ্গালীর ভাষা, এখনও বোধহয় সম্পূর্ণভাবে তাহা মুক্ত হইতে পারে নাই। আবার নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ—তাহারাও তো শিক্ষিত—যে ভাষা ব্যবহার করেন, সাধারণ লোকে তাহা করে না। যেমন কলম না বলিয়া তাহারা বলেন লেখনী, দোয়াত না বলিয়া বলেন মস্যাধার, আমার কপাল না বলিয়া বলেন দুরদৃষ্ট। ছেলে বুড়ো না বলিয়া বলেন আবালবৃদ্ধ, আদালত না বলিয়া বলেন বিচারালয়, গাল গল্প না বলিয়া বলেন স্বকপোলকল্পিত ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ নারায়ণ বলেন লিখিত ভাষা এমন হওয়া চাই, যাহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতি ব্যবহার করিতে পারে। এই সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের অভিপ্রায়ানুসারে তাহার পূর্ব্বতন সহপাঠী 'ধ্রুবতারা' উপন্যাস লেখক যতীন্দ্র মোহন সিংহ মহাশয় ১৩২২ সালের আষাঢ় মাসের নারায়ণে 'ভাষার কথা' প্রবন্ধটি যে লেখেন তিনি উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই বিষয়ে তখন অধ্যাপক মণ্ডলীর মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইত, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন অধ্যাপক বলেন—

“রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ যত সহজে বুঝিতে পারি, বাঙ্গলা গীতাঞ্জলি তত সহজে বুঝিনা কেন?”

অপর অধ্যাপক বলেন “রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীতে চিন্তা করেন বলিয়া”।

সাহিত্যে প্রাণ জিনিষটাই আসল জিনিষ, একথা চিত্তরঞ্জন সর্ব্বদা বলিতেন। নারায়ণের সেবক মণ্ডলীরও তাহাই ছিল উদ্দেশ্য। সবুজ-পত্রে এই প্রাণের অভাব ছিল বলিয়াই নারায়ণ উক্ত পত্রানুমোদিত ভাষা ও প্রাণের অভাবের প্রতিবাদ করেন। উক্ত যতীন্দ্র সিংহ মহাশয় উপসংহারে বলিয়াছিলেন—

"একজন গৃহস্থ তাহার নিমন্ত্রিত অতিথিদিগকে ভোজনের জন্ম নানারূপ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলেন। ভোজনের সময় দেখা গেল ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে সব রকম মসলা যথোচিতরূপে দেওয়া হইয়াছে, অথচ সেগুলি সব বিস্বাদ হইয়াছে। তাহার কারণ ভুলক্রমে একটা জিনিষ তাহার কোনটার মধ্যেই পড়ে নাই—সেই জিনিষটার নাম লবণ। কবি রবীন্দ্রনাথও রাশি রাশি কাব্য রচনা করিয়া শুধু একটি একটি বস্তুর অভাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও সেগুলিকে স্বদেশবাসীর উপভোগ্য করিতে পারিতেছেন না। সে বস্তুটির নাম "প্রাণ"।" প্রাণ ছিল বলিয়াই কবি রজনী সেনের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" গানটি পল্লীতে পল্লীতে সকলে গাহিয়া বেড়াইত, কিন্তু 'সোণার বাংলা' গানের তেমন আদর হয় নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত লোক আর পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত লোক একরকমভাবে কথা জানে না! আবার স্থান বিশেষের ভাষাই কেবল ব্যবহৃত হয়, ইহাও অপর স্থানের লোক চাহিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে—লিখিত ভাষায় 'আমি করিতে পারিবনা' কথাটি সমস্ত বাঙ্গালীর বোধগম্য। কিন্তু কথিত ভাষা হইলে

কলিকাতার লোক লিখিবে—আমি কোর্ত্তে পার্ব্বোনা
যশোহরের লোক লিখিবে—আমি কর্ত্তী পারবো না
নদীয়ার লোক—আমি কর্ত্তে পারবো না
ঢাকার লোক—আমি করতে পারুম না
ময়মনসিংহ—আমি কর্ত্তাম পার্ত্তাতাম না
নোয়াখালী—আমি কর্ত্তাম্ হার্ত্তাম্ না

ইংরাজী why কথাটি কলিকাতার লোক বলে ক্যানো? কেহ বলে ক্যান? কেহ বলে কেনো? ঢাকার লোক বলে ক্যান্? মুর্শিদাবাদের লোক বলে "ক্যানে"? কিন্তু "কেন?" লিখিলে সকলেই বুঝিতে পারে।

নারায়ণের প্রচেষ্টাই সফল হয়। শিক্ষিত লোক সহজ সরল বোধগম্য ভাষায় বাঙ্গলা লিখিলেই সমস্ত বাঙ্গালীর এক ভাষা হইবে ইহাই তখন সবুজপত্রের দল ব্যতীত সকলেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নারায়ণের লেখক মণ্ডলীরও এই মতই ছিল।

আমরা কলাবিদ্ যে কেবল নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা শিক্ষা দেন না, চিত্তরঞ্জনের প্রবন্ধ হইতে তাহা দেখাইয়াছি। এইবারে কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটি যে নারায়ণের লেখক মণ্ডলী গ্রহণ করেন তাহাও দেখাইব। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা নহে, কিন্তু নীতিশিক্ষার যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি-ব্যাখ্যার দ্বারা তাহারা শিক্ষা দেন না। তাহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য"।

বিবিধ প্রবন্ধ—ভবভূতি

'নারায়ণে' রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রতিবাদ হয়, তাহাতে কেহ কেহ নারায়ণের বিরোধীও হইয়া উঠেন। এই বিষয়ে অধ্যাপক কৃষ্ণ বিহারী গুপ্তের সঙ্গে যে কথোপকথন হয়, এইখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

একদিন সাহিত্য প্রসঙ্গে ভাগলপুর হইতে সমাগত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় বলিলেন—"দেখুন, আপনার একটা বড় বদনাম রটিয়াছে।"

চিত্তরঞ্জন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি বলুন ত' ?

কৃষ্ণ—আপনি নাকি রবি-দ্বেষী!

চিত্ত—কথাটা ঠিক হইল না। আমি রবিবাবুর ক্রিটিক্ বটে, কিন্তু

বিদ্বেষী নই। আমি তাঁর অলৌকিক প্রতিভা অস্বীকার করি না, কিন্তু তাঁর কবিতা আমার ভাল লাগে না।

কৃষ্ণ—অজিত চক্রবর্ত্তী প্রণীত মহর্ষির জীবন চরিতের যে ধারাবাহিক সমালোচনা 'নারায়ণে' বাহির হইতেছে, তাহাও বিদ্বেষ প্রসূত বলিয়া লোকে মনে করিতেছে!

চিত্তরঞ্জন—লোকে যদি মনে করে তা'হলে আমি নাচার। অজিত চক্রবর্ত্তীর বইখানাতে অনেক ভুল আছে। সেগুলোর সংশোধন হওয়া দরকার বলিয়াই এই সমালোচনা প্রকাশিত হইতেছে।

বঙ্গবাণী, ১৯২৫ দেশবন্ধু-স্মৃতি-কথা—পৃঃ ২৩৯

তিন চারি বৎসর নারায়ণের সেবা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত তিনি বড় বড় মোকদ্দমাই করিতেন, সন্ধ্যার পরে সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা হইত। ১৯১৭ ও ১৯১৮ রাজনীতি সংক্রান্ত কাজে সময় সময় খুব ব্যস্ত থাকিলেও, নারায়ণের সেবায় কোন ব্যাঘাত হয় নাই। ১৯১৯ সালে প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ঝড়বন্যার জন্য অর্থ সংগ্রহ ও বিক্রমপুর ভ্রমণ, পাঞ্জাব্ প্রদেশের অনুসন্ধান কমিটীর কার্য্য এবং পরে ডুমরাওন মোকদ্দমায় ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাহাকে বাহিরেই থাকিতে হয়। তারপরে রাজনীতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে কার্য্যের চাপ এমন আসিয়া পড়িল যে নারায়ণের ভার ১৩২৭ হইতে শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক করিয়া তাহার হস্তে অর্পণ করেন। কয়েক দিন মন্দ চলিল না। বারীন্দ্র বাবু ও উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "দ্বীপান্তর" ও "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা" প্রবন্ধ কিছু দিন পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়। ক্রমে চিত্তরঞ্জনও সরিয়া যাইতে লাগিলেন, নারায়ণও আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

সাহিত্যিকদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি

'নারায়ণ' পত্রিকা যে কেবল সেই সঙ্কট সময়ে জাতির অসাধারণ

হিত সাধন করিয়াছিল তাহা নয়, দেশের সাহিত্যিকগণেরও মর্য্যাদা তিনিই বাড়াইয়া দিয়াছেন। যে কোন লেখকের রচনা বাহির হইলেই তিনি যথেষ্ট মূল্য দিতেন। কোন একজন কবিকে একশতটি টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, এ আপনার উপযুক্ত না হইলেও, আপনি গ্রহণ করিলে আমি বাধিত হইব। লেখকের মূল্য দিতে পারিলেই তিনি কৃতার্থ বোধ করিতেন। অতঃপর লেখকগণ প্রথমে বুঝলেন যে পত্রিকায় লেখা দিলে টাকাও পাওয়া যায়।

তিনি সাহিত্যিকগণ লইয়া একটী গোষ্ঠী করেন। তাহাদের সঙ্গে চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কৃষ্ণদাস, রামপ্রসাদ, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনা বিষয়ে আলোচনায় অপার আনন্দ লাভ করিতেন। এই সব বিষয়ে সাহিত্যিক-গণের পরস্পর মিলনে বিশেষ সুবিধা হয় এবং তাহারাও নিজেদের গৌরব বুঝিতে পারেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিকগণ নানাভাবে সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতেন না এবং কাহারও চিকিৎসা হয় না, কাহারও মেয়ের বিবাহ টাকার অভাবে হয় না, কাহারও স্বাস্থ্যের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক, তিনি মুক্ত হস্তে ছুটিয়া আসিতেন। কবি গোবিন্দ দাসের চিকিৎসার অভাব হইলে ঢাকার ব্যারিষ্টার প্রাণকিশোর বসুকে চিকিৎসার খরচ বহন করিবেন বলিয়া টেলিগ্রাম করিয়া দেন। বস্তুতঃ সাহিত্যিকগণকে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই।

এইভাবে কয়বৎসর 'নারায়ণ' দেশের জনগণকে জাতি, ধর্ম্ম, সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া অন্তর্ধান করেন। কিন্তু বাঙ্গলার বুকে তাঁহার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।

(২) বাঙ্গলার কথা

পত্রিকা সম্পাদনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দ্বিতীয় অভিযান "বাঙ্গলার কথা"। ইহা সপ্তাহে একবার বাহির হইত। ইহা সংবাদপত্র নহে, জাতীয়তা মূলক প্রবন্ধই ইহাতে বেশী থাকিত।

প্রথমে ইহা বাহির হয় ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে (১৩২৮, ১৪ আশ্বিন)। ইহা মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন সংখ্যা বলিয়া বাহির হয়। এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন চিত্তরঞ্জন নিজেই এবং প্রথম সংখ্যার অধিকাংশ প্রবন্ধই ছিল তাঁহার।

ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল ৪৲ টাকা। সহকারী সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এবং কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। কাগজখানির নাম যে 'বাঙ্গলার কথা' হয় তাঁহার একটি কারণ ছিল। ১৯১৭ সালে চিত্তরঞ্জন ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা "বাঙ্গলার কথা" নামেই অভিহিত হয়। এইখানেও সেই নামটিই গৃহীত হয়।

প্রথম সংখ্যার বিষয় সূচী ছিল :—

১। বাঙ্গলার কথা

২। স্বরাজ সাধনা

৩। বস্ত্র-যজ্ঞ

তিনটী প্রবন্ধই দেশবন্ধু লিখিত—চতুর্থটি ছিল "শিক্ষার বিরোধ" সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত। ইহা রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধের উত্তর।

পূর্ব্বের "বাঙ্গলার কথা" হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কথা উদ্ধৃত করা হয়। যেমন "বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক বাঙ্গালী বাঙ্গালী।...বল নারায়ণ, বল আল্লা, বল 'বন্দে মাতরম্'।"

'বস্ত্রযজ্ঞ' প্রবন্ধে দেশবন্ধু লেখেন :—"মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—

কংগ্রেস বলেছে—বিদেশী কাপড় পোড়াও।” আমার জ্ঞানী গুণী বন্ধু বলেছেন—“ধ্বংস কর না, ভস্ম কর না, বলেছেন খুলনায় পাঠিয়ে দাও, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত আমার ভাইরা রয়েছে তাদের কাছে পাঠিয়ে দাও।” কথাটা ব'ল্‌বা মাত্র একটা ভাব আসে—পরের উপকার করার ভাব। আজ আপনাদের ভাব হওয়া, উপলব্ধি করা চাই কেন বিদেশী বস্ত্রকে ধ্বংস করতে বল্‌ছি। বিদেশী বস্ত্রের অর্থ কি—আমার কাছে—কি মানে জানেন? এগুলো আমাদের দাসত্বের নিদর্শন—আমরা যে ব্যাধিগ্রস্থ সে ব্যাধির নিদর্শন। আমাদের অপমান! আমাদের ধর্ম্মহীনতা, আমাদের দাসত্ব—এ সকলের নিদর্শন।”

ধরপাকড় সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রতি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যে নিবেদন করেন, ১৬ই ডিসেম্বরের কাগজে বাহির হয়। তিনি বলেন :

“বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে ‘কমিউনিক’ বাহির করিয়াছেন, পুলিশ কমিশনার যে হুকুম দিয়াছেন, বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা অনুসারে যে সব হুকুম জারি করিয়াছেন তাহাতে খুব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসনকর্ত্তারা অসহযোগ আন্দোলনকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই কারণে বাঙ্গলার অধিবাসীরাও স্বাধীনতা লাভের জন্য এই সংগ্রামে অধ্যবসায় সহকারে তাঁহাদের সকল শক্তি প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। আমি তাঁহাদিগকে আশা ও উৎসাহ বাণী শুনাইতেছি। আমি গোড়া হইতেই জানিতাম যে স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসক সম্প্রদায়ই সর্ব্বপ্রথমে আইন ভঙ্গ করিবেন। গোড়া হইতেই ১৪৪ ধারার হুকুম জারী করিতে আরম্ভ করিয়া এই শাসকবর্গ তাহাদের বেআইনী আচরণ আরম্ভ করিতেছে। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কর্ত্তারা এই অন্যায় ও বেআইনী ভাবে ঐ ধারার প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছেন। এখন যখন আন্দোলনটি সফল হইবার উপক্রম করিয়াছে—কর্ত্তারা এইবার ভুলিয়া যাওয়া আইন ও

পরিত্যক্ত প্রণালীর আশ্রয় লইয়াছেন এবং এই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে যথেচ্ছভাবে ১৪৪ ধারার প্রয়োগ করা হইতেছে।

"আমাদের কর্ত্তব্য অতি স্পষ্ট। ভারতীয় জাতীয় সমিতি ঘোষণা করিয়াছে যে স্বরাজই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, এবং এই অসহযোগই সেই লক্ষ্যস্থানে পৌছিবার একমাত্র উপায়। কর্ত্তারা যাই করুক না কেন, জাতীয় দল কখনও তাহাদের আদর্শ ভুলিবেন না। এখন বাঙ্গলা দেশের বিষম পরীক্ষা উপস্থিত। এ ব্যাপারের হার জিত সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি আমার দেশবাসীকে ধীরতা অবলম্বন করিয়া থাকিতে অনুরোধ করিতেছি। আনন্দের সহিত সকল কষ্ট সহ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি; আমার অনুরোধ—তাহারা যেন কংগ্রেসের আদিষ্ট পবিত্র কর্ত্তব্য-পথ পরিত্যাগ না করেন।

ভলন্টিয়ারগণই কংগ্রেসের কাজ করিতেছে—ভবিষ্যতেও করিবে। সকলেই এই কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া রাখুন যে বালক স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে কর্ম্মিমাত্রেই স্বেচ্ছাসেবক।

"আমি কংগ্রেসের কার্য্যে আমাকে ভলন্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবক রূপে নিয়োগ করিতেছি। আমি আশা করি কয়েক দিনের মধ্যেই এই প্রদেশে কাজ করিবার জন্য দশ লক্ষ ভলন্টিয়ার উত্থিত হইবেন। আমাদের ব্রত অতি পবিত্র, আমাদের কার্য্যপ্রণালী শান্ত ও সংযত ভাবে আপনারা পালন করুন, ইহা আমার একান্ত অনুরোধ ও নির্দ্দেশ।"

দেশবন্ধুর শেষবাণী

"হে ভারতের নরনারীবৃন্দ, আপনাদের নিকট আমার এই শেষ বাণী। যদি আপনারা দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে জয় লাভ অদূরবর্ত্তী। এইরূপ দুঃখ বিপদের মধ্য দিয়াই জাতির

উত্থান হইয়া থাকে। এ দুঃখ বিপদ আপনাদিগকে সাহস ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত সহ্য করিতে হইবে। মনে রাখিবেন যতদিন আপনারা অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়া থাকিবেন ততদিন আপনারা আমলাতন্ত্র শাসনকে অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলে আপনাদের পরাজয় অনিবার্য্য। স্বরাজই আমাদের কর্ম্মস্থল। ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া নহে একেবারে সম্পূর্ণ স্বরাজই আমাদের পাইতে হইবে। হে ভারতের নরনারীবৃন্দ, যে লক্ষ্যের জন্য আমরা যে এত প্রয়াস করিতেছি তাহা পাইব কি না তাহা আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে।

"গভর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বী আমার বন্ধুগণের নিকট আমার এই নিবেদন—প্রারম্ভকাল হইতে পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া আপনারা দেখুন, আপনারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সে পথ ধরিয়া কখনও কোনও জাতি কি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছে? আপনাদের মধ্যে একজনের নিকটও যদি আমার এই প্রার্থনা পৌছে তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি আমলাতন্ত্রী শাসকের বিরুদ্ধে ভারতের এই বিরোধের কি তিনি পক্ষ লইবেন? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতদ্বৈধ হইলে তাহাদের মিটমাট করা সম্ভব, কিন্তু শাসক সম্প্রদায়ের সহিত যে বিষয়ে আমাদের মত পার্থক্য তাহাই যে আসল মুক্তির কথা। এই জন্যই আপনারা—যাঁরা—ভারতবাসীর পক্ষ না গ্রহণ করেন, মনে রাখিবেন আপনারা অন্যায় শাসনের পক্ষ গ্রহণ করিতেছেন।

"ভারতের ছাত্রগণকে আমি এই কথা বলি—তোমরা ভারতের আশা ও গৌরবস্থল। দুই আর দুইয়ে যোগ করিতে পারিলেই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না। আমাদের সকলের দেশজননীর সেবাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়। দেশমাতৃকা তাহার কাজে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। তোমাদিগের মধ্যে কে সেই আহ্বানে সাড়া দিবে, কে সেই অমৃত লাভে

আমাকে সহায়তা করিবে, কে সব ছাড়িয়া আমার সহগামী হইবে—সে এসো।"

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধুকে পুলিস-বাহিনী আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়।

১১শ সংখ্যা ১৬ ডিসেম্বর যে কাগজ বাহির হয় তাহারও সম্পাদক ভাবে চিত্তরঞ্জন দাশের নামই বাহির হয়।

দ্বাদশ সংখ্যা ৮ পৌষ ২৩ ডিসেম্বর দেশবন্ধুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর নাম সম্পাদিকা হিসাবে বাহির হয়।

এই সংখ্যার কয়টি প্রবন্ধের নাম—রুদ্রের আবেগ—সুবোধ রায়। বিদ্বেষ নয় প্রেম, গান্ধী মুক্তির পথ জেল—সুরেন হালদার। বাংলার কথা—অনঙ্গমোহন দাম। স্বরাজ ও আমলাতন্ত্র—সত্যেন্দ্র মজুমদার। ত্রয়োদশ সংখ্যায় সালভরকা ওয়াদা—সুবোধ রায়। মহাত্মা গান্ধী শক্তি সাধনা—সুকুমার রঞ্জন দাশ। আসল কথা—দেবকুমার রায়চৌধুরী। দেশবাসীর প্রতি—বিশ্বমোহন সান্যাল। এই সব প্রবন্ধ বাহির হয়।

১৫ সংখ্যায় বাসন্তীদেবীসম্পাদিকা, প্রকাশক—ধীরেন মুখোপাধ্যায়। দেশের বাণী প্রবন্ধ নগেন্দ্র গুহরায় কর্তৃক লিখিত হয়।

২৬ সংখ্যায় ২রা বৈশাখ ১৩২৯—১৫ এপ্রিল ১৯২২ এর কাগজে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর চট্টগ্রামের অধিবেশনে সভানেত্রী বাসন্তী দেবীর অভিভাষণ বাহির হয়। ইহার শেষ কয় ছত্র কবি নজরুলের গানের কয় পংক্তি :—

অভয়মন্ত্র

বল্ নাহি ভয় নাই ভয়।
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়।

—বাসন্তী দেবী

১৯২২—১৭ মার্চ্চ

১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া

১৫ জানুয়ারী—মির্জ্জাপুর ও গোলদিঘি

১৬ জানুয়ারী—পাঁচটি স্থানে সভা করা হইবে

কলেজ স্কোয়ার, হ্যালিডে পার্ক, ওয়েলেস্‌লি, বিডন স্কোয়ার

১৭ জানুয়ারী—ভবানীপুর হরিশ পার্কে, কলেজ ও বিডন স্কোয়ারে।

১৯ জানুয়ারী—বিডন স্কোয়ার, জোরাবাগান, হরিশপার্ক, বিড়লাপার্ক।

হরিশ পার্কের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়ায় দেশবন্ধু দাশের বাড়ীর সম্মুখে সভা ভঙ্গের পর পূর্ণ মুখার্জি ডি, সি উপস্থিত হয়। ডি, সি কীক্ পদাঘাত করিয়া কয়েকজন মহিলা ও স্বেচ্ছাসেবক আহত করে, তাহারা মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। হাঁসপাতালে ২৩ জন স্বেচ্ছাসেবক ভর্ত্তি হয়।

৪ ফেব্রুয়ারী—

১৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে Sergeants নির্দ্দয় ভাবে মারে- শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা আসেন। কে একজন ছোরা বার করিয়া সার্জেণ্টের গাড়ি হইতে বাহিরে গিয়া তাহার হস্তে ভীষণ আঘাত করে।

১৬ ডিসেম্বর ১লা পৌষ ১১ সংখ্যায় হেমন্ত সরকারের স্থানে অরবিন্দ মুখার্জ্জী সহকারী সম্পাদক হয়েন।

দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র শ্রীমান চিররঞ্জন দাশের কথা (১৯২১, ৭ ডিসেম্বর তিনি গ্রেপ্তার হন)

"আমরা (আমি ও আর সাতজন স্বেচ্ছাসেবক) কয়েদীর গাড়ীর ডানদিকে বসিয়াছিলাম। সার্জ্জেণ্টরা আমাদের কাহাকেও কিছু না বলিয়া শুধু শুধু খোঁচা দিতে থাকে এবং আমাদিগকে ডান দিক হইতে বামদিকে ঠেলিয়া দেয়। আমরা লালবাজারে নামিলে সার্জ্জেণ্টেরা

স্বেচ্ছাসেবকদের ঘাড় ধরিয়া নির্দ্দয় ভাবে ঠেলিয়া দেয় এবং আমার বাহুটা ধরিয়া মোচড়াইয়া দেয়। মোচড়ান এমন জোরে হইয়াছিল যে আর একটু হইলেই হাড় ভাঙ্গিয়া যাইত। তাহার পর সার্জ্জেণ্টেরা আমাদিগকে হাজত ঘরে লইয়া যায়। তাহারা তখনই আবার স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বেটন দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করে। আমি প্রতিবাদ করিলে তিনজন সৈনিক তিনদিক হইতে আমাকে লাথি মারিতে থাকে। শেষে ইহারা চলিয়া যাইবার সময়ও আমার মাথায় আঘাত করে। স্বেচ্ছাসেবক তেওয়ারী জখম হইয়াছে, স্বেচ্ছাসেবক সুধীর মুখার্জী ঘুশি খাইয়া অজ্ঞানের মত হইয়া গিয়াছিলেন। সার্জ্জেণ্টদের প্রহারে স্বেচ্ছাসেবকরা সকলেই অল্পবিস্তর জখম হইয়াছেন। সুখের বিষয় জাতীয় পুলিশ কর্ম্মচারীরা আমাদের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুরতাপূর্ণ ব্যবহারে যোগদান করেন নাই।"

পরদিন ৭ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবী ও সুনীতি দেবীসহ (এখন শ্রীযুক্তা সুনীতি মিত্র) গ্রেপ্তার হন। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন—

"আমরা বন্দী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বাহির হইয়াছিলাম। যখন আমাদের তরুণবয়স্ক বালকেরা সানন্দে ও সসম্মানে কারাবাস বরণ করিয়া লইতেছে, তখন তাহাদের জননী হইয়া গৃহে বসিয়া থাকা আমাদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। যে কাজ এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে আমাদের ভগিনীরা তাহাই গ্রহণ করুন ইহাই আমার প্রার্থনা। তাহারা যেন ভুলিয়া না যায় কারারুদ্ধ ভ্রাতাভগিনীগণকে কারামুক্ত করিতেই হইবে। তাহারা আমাদের মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন। আমরা কি আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিমুখ হইব?"

(৩) ফরওয়ার্ড (অগ্রগতি)

১৯২১ ও ১৯২২ সালে যদিচ "বাঙ্গলার কথা" বাহির হয়, কিন্তু তাহাতে প্রচারকার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না বলিয়া চিত্তরঞ্জন একখানি ইংরাজী কাগজের আবশ্যকতা অনুভব করেন। সমস্ত পরামর্শ জেলখানায় বসিয়াই হয় এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমলও অংশীদার লইয়া যৌথ কোম্পানী করিয়া মেদিনীপুর জেলা হইতেই অনেক টাকা উঠাইয়া দিবেন প্রতিশ্রুত হন। দেশবন্ধু জেল হইতে বাহির হইয়া অনেকের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সম্বন্ধে কোম্পানীর গঠন বিষয়ে তিনি একটি নিয়মাবলী (Prospectus) ছাপাইয়া শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের সহায়তায় গয়া কংগ্রেসে প্রচার কার্য্য করেন। ২২ ডিসেম্বর (১৯২২) তারিখেই সমস্ত বিষয় স্থির হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুও একজন ডিরেক্টার হন। শাসমল হন ম্যানেজিং ডিরেক্টার। শ্রীপ্রভুদয়াল হিম্মতসিংকাও ডিরেক্টার হন।

বীরেন্দ্রনাথ মার্চ্চ (১৯২৩) মাসে দেশবন্ধুকে জানান যে তিনি কার্য্যগতিকে মেদিনীপুর থাকিতে বাধ্য হইবেন, সুতরাং কার্য্যভার অন্য কাহারও উপর অর্পণ করিলেই ভাল হয়। তাই সকলের মতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুই ম্যানেজিং ডিরেক্টার মনোনীত হন। তিনি ২২ মার্চ্চ (১৯২৩) নূতন করিয়া নিয়মাবলীর খসড়া উপস্থিত করেন। দেশবন্ধু নিজের চেষ্টায় নাগপুরে কিছু টাকা পাইলেন আর মান্দ্রাজে ঘুরিয়া পঁচিশ হাজার টাকা উঠাইলেন।

স্থির হয় যে দেশবন্ধু কাগজের প্রধান সম্পাদক থাকিবেন। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হইবেন Joint working editors, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এসিষ্ট্যাণ্ট এডিটার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ২৫

সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবু ও মনোমোহন বাবু (১৮১৮ সালের) তিন রেগুলেসনে ধৃত হইলে, সুভাষবাবুকে করা হয় ম্যানেজার এবং সেক্রেটারী।

১৯২৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে ফরওয়ার্ড আত্মপ্রকাশ করে। সুভাষচন্দ্র প্রাণপণ খাটিতেন, অনেক সময় সারারাত্রি খাটিয়া টেবিলের উপরেই শুইয়া থাকিতেন। শ্রীযুক্ত মৃণালবাবু দেশবন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সমস্ত বিষয় সম্পাদনা করিতেন। শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী এসিষ্ট্যাণ্ট এডিটার হন। সত্যবাবু এশিয়া সম্মেলন (Asiatic Federation) নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা দেশবন্ধু বিশেষ আদর করেন। তাহার Lord Lytton must go প্রবন্ধও খুব ভাল হয়। ফরওয়ার্ড সম্বন্ধে মৃণালবাবু যে 'স্মৃতিকথা' লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। এপ্রিল মাসে ফরওয়ার্ড ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া যায়। ফরওয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজের সমস্ত স্বত্ব খরিদ করায় ১৯২৪, ১৬ই এপ্রিল হইতে ১৯, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট হইতে "ফরওয়ার্ড" বাহির হয়। Forward (with which is incorporated The Indian Daily News), এইরূপ লিখিত হয়।

এই সময় নগদ অনেক টাকার দরকার হয়। বর্তমান লেখক প্রায় ষাট হাজার টাকা তুলিয়া দেয়। শ্রীযুক্ত শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় টাকা সংগ্রহে সময় সময় তাহাকে সহযোগিতা প্রদান করেন। কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকার কমে এতবড় কাগজ হয়না, অথচ দেশবন্ধু ফরওয়ার্ড বাহির করেন একরকম বিনা অর্থে। বিশ্বাসেই কার্য্য সম্পন্ন হয়, এবং বাহির করিবার পরে কাগজের সুযশ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু লিখিয়াছেন :

"ফরওয়ার্ড বাহির হইতেছে, হুহু বিক্রী বাড়িয়া যাইতেছে। আমি

দেশবন্ধুকে বলিলাম এইবার ছাপাখানার ভাল বন্দোবস্ত করার দরকার। নচেৎ কাগজ থাকিবেনা। তিনি বলিলেন তুমি কাগজের পসার বৃদ্ধির দিকে দেখ, টাকার জন্য ভাবিওনা। কিছুদিন পরেই, শুনিলাম শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয় দেশবন্ধুর অনুরোধে "ডেলি নিউজ" কাগজের প্রেস এবং Good will প্রভৃতি ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

"প্রতি রবিবার আমি ভবানীপুর বাড়ীতে গিয়া দেখা করিতাম। কোন এক রবিবার না গেলে তিনি উৎকণ্ঠিত হইতেন। ঘন ঘন যাই, তাঁহার সপাপরামর্শে থাকি এইরূপ অভিপ্রায় তিনি অনেকবার প্রকাশ করিয়াছেন। এমন অনেক সময় হইয়াছে যে মতের মিল না হইলে তিনি আমাদের স্বাধীনতায় কোনদিন হস্তক্ষেপ করেন নাই।"

ফরওয়ার্ডের খুব উন্নতি হইয়াছিল ১৯২৪ সালে ; ফরওয়ার্ডের বিক্রী হইত দৈনিক ২৫।৩০ হাজার। তখনকার দিনে এত বেশী বিক্রী কোন কাগজের হয় নাই। এত বেশী সুনামও কোন ভারতীয় সংবাদ পত্রের ছিল না। বন্দোবস্ত যাহারা করিতেন খুব ভালই করিতেন। কিন্তু দেশবন্ধুর সুনামে এবং অক্লান্ত চেষ্টায়ই ফরওয়ার্ডের উন্নতি হয়। Art and Literature, Stage and Screen, Science, Philosophy প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ থাকিত। মঞ্চ ও পর্দার প্রথম সম্পাদক ছিলেন বর্ত্তমান লেখক, তারপরে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ঐ বিভাগটী উঠিয়া যায়। দেশবন্ধু দার্জ্জিলিংএ বসিয়াও কি রকমে ফরওয়ার্ডের উন্নতি হইবে খুব চিন্তা করিতেন। তিনি রাখালদাস বাবুকে বলিয়াছিলেন—

"আমার ইচ্ছা কাগজখানা রোজ ১২ পাতা না ক'রে ১৬ পাতা করি আর রবিবারের দিন ২৪ পাতার বদলে ৩২ পাতা করি। রবিবারের দিন যে লেখা বেরোয়, তার ধরণ একেবারে বদ্‌লে না ফেল্‌তে পারলে কাগজ খানা স্থায়ী হবেনা"—

করওয়ার্ডের অনুকরণেই অন্যান্য কাগজ নিজ গণ্ডি ছাড়িয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি দার্জ্জিলিংএ বলিয়াছিলেন—

"একটা বড় বাড়ী নিয়ে আমি একদিকে থাক্‌ব, কাগজে লিখব। আর কাগজ যাতে ভাল চলে, চেষ্টা ক'রব"—

কিন্তু তাঁর এই বাসনা অপূর্ণ রহিল।

(৪) কীর্ত্তন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সর্ব্বাপেক্ষা কীর্ত্তনই তাঁহার ভাল লাগিত। অসংখ্য সঙ্গীত তিনি রচনা করিয়াছেন। কীর্ত্তনে তিনি পরমানন্দ উপভোগ করিতেন। মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে তিনি কীর্ত্তন শুনিতে চাহিতেন না। তিনি বলিতেন "দেখ, কীর্ত্তন আমার এত ভাল লাগে যে আমি যদি যাই তো ৫।৭ দিন আমার ঘুম হবেনা। আমার মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তেজিত হবে, সামলাতে পারব না, সবে শরীর সুস্থ হচ্ছে, এখন যাওয়া বোধ হয় সঙ্গত হবেনা।"

কীর্ত্তনের প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে, তবে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটী স্মৃতি কথাই পাঠককে উপহার দিব।

"একবার আমি কলিকাতার পথে একজন ভিখারী বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ পাই। কোন বাটীর দ্বারে দাঁড়িয়ে সে সুমিষ্ট কণ্ঠে গাচ্ছিল—

"পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু—

পথের ভিখারীকে চণ্ডীদাসের পদাবলী মধুরভাবে গাইতে শুনে আমি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ভাল ক'রে তার গান শুনি এবং ঠিকানা জেনে নিই। আমার মুখে একথা শুনে চিত্তরঞ্জন অধীর হ'য়ে উঠলেন। চণ্ডীদাসের পদ! পথের ভিখারী গায়! আমাকে শীঘ্র শুনান। পরদিন সন্ধ্যার সময় নিয়ে গেলাম। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত

মুগ্ধ হ'য়ে তিনি গান শুনলেন তারপরে প্রসন্ন হয়ে গায়ককে আমার চতুর্গুণ পুরস্কৃত করলেন"।

উপেন্দ্রবাবু দেশবন্ধুকে না বলিয়া গায়কের মুখে দেশবন্ধুর গানটি জুড়িয়া দিয়াছিলেন—

"আজিকে বঁধু থেকোনা দূরে
গেয়োনা অমন করুণ সুরে।"

শ্রীমতী অর্পণা দেবী তাঁহার কীর্ত্তনের ধারাটি রক্ষা করিয়া উপযুক্তা কন্যার কাজ করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাহিত্যকে দেশবন্ধু সমগ্র জীবনের অনুভূতিই মনে করিতেন। মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে তিনি বলিতেন "যদি পাঁচ বৎসর বাঁচি, তা হ'লে দুবৎসর যা করচি তাই করব, বাকী তিনবৎসর গঙ্গাতীরে সাহিত্য সাধনায় কাটাব।"

হায়, তখন কে জানিত যে তাঁহার অমূল্য জীবনের অবসান প্রায় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে! তিনি গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-সাধনা চিরস্মরণীয় থাকিয়া জাতির কল্যাণ সাধন করিবে।

সমাপ্ত